অতিথি, দুদিনের

শ ও ক ত আ লী

ছুটির দিনে সমীর হোসেন কোথাও বের হন না। তাই সকাল থেকেই এক ধরনের আলসেমিতে তাকে পেয়ে বসে। ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরও বিছনায় পড়ে থেকে বিদায়ী ঘুমের আমেজ উপভোগ করেন। তারপর ওঠেন, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে বসার ঘরে যান। খবরের কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বসেন, নাড়াচড়া করতে করতেই খাবার ঘর থেকে কাজের মেয়ে মজিলা বানুর ডাক আসে, তখন নাস্তা খেতে যান।

আজ মজিলা বানুর ডাক আসে না। একবার বোধহয় রানী ডেকেছিলো, তখন তার মনোযোগ ছিলো তার বন্ধুর লেখা একটা উপ-সম্পাদকীয়র ওপর। দ্বিতীয়বারও রানীর গলা শোনে। এবার তিনি সাড়া দেন। বলেন, কী হয়েছে? ডাকছিস কেন?

তোমার কি হয়েছে, সেটা বলো, আমার কিছু হয়নি, রানী বলে, আজ কি তুমি ভুখ হরতাল করবে?

ভুখ হরতাল? সমীর একটু অবাক হন। বলেন, সেটা আবার কি?

কেন, ইন্ডিয়ান টিভিতে হিন্দী খবর শোনো না, ওরা অনশন ধর্মঘটকে ভুখ হরতাল বলে। আটটা বেজে গেছে, তবু তুমি খাবার টেবিলে আসছো না কেন? আজ অফিসে যাবে না?

না, আজ বৃহস্পতিবার, আমার অফ ডে,

ও, রানীর খেয়াল হয়। বলে, তাই বলো, আমি তো ভাবছিলাম, তুমি বোধহয় ভুখ হরতাল করবে আজ।

হাসাহাসি করতে করতে বাপ মেয়ে খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসে। পেস্নটে প্রিয় খাদ্যবস্' দেখে সমীর সাহেব রীতিমতো অবাক হন। সোচ্ছাতে বলে ওঠেন, এসব কী? কে করলো? ওসব জিনিসকে কী বলছো কেন? ওগুলো যে খাবার জিনিস তা দেখতে পাচ্ছো না?

কিন্' কে করলো? কে বানালো? এই লুচি আর আলুর ডালনা?

কেন তুমি ভুলে গেছো? যে ওসব বানাতো, সে কি কাউকে রেখে যায়নি বলে তুমি মনে করো? সব তুমি ভুলে গেছো?

না না তা ভুলবো কেন? মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সমীর হোসেন স্নেহভরা হাসি হাসেন। বলেন, তোর মা

This File downloaded from
http://doridro.com

তোকে সবকিছুই শিখিয়ে দিয়ে গেছে। খালি আমাকেই কিছু শেখায়নি-
বাবা মেয়ের যখন এই রকম কথাবার্তা চলছে? দু;জনের খাবার মুখে তুলতে যাবে ওই সময় কলিং বেল বেজে ওঠে।
খাবার মুখে না তুলে রানী পাতে নামিয়ে রেখে কাজের মেয়ে মজিলাকে ডাকে। বলে, যা তো, দেখ গিয়ে এই সময় আবার কে এলো।
দু'জনে মুখে খাবার সবে তুলেছে, ঠিক তখনই মজিলা ফিরে এসে বলে, আপা চ্যাংড়া মতোন একটা লোক আসছে, বইললো লন্ডন-এ বাড়ী। খালুজান চিনে। নাম বইললো আভিলা সেন না কী য্যানো। বুঝলাম না।
ঠিক আছে, রানী উঠে। বলে, বাবা তুমি নাস্তা খাও, আমি দেখছি। রানী উঠে যায়। তারপর মিনিট দুই পরই ফিরে এসে বলে, লোক নয়। একটা ছেলে, ছাত্রটাত্র হবে। হ্যাঁ লন্ডন থেকেই এসেছে বললো। নাম অভিলাষ সেন। ওর বাবা পরিতোষ সেন তোমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিলো। বগুড়ায় ওখানেই নাকি ওদের আদি বাড়ি ছিলো। আমি ওকে বসার ঘরে বসিয়েছি, তুমি খাওয়াটা শেষ করো।
মেয়ের কথা শুনে সমীর হোসেন খেতে খেতেই দাঁড়িয়ে যান। সবিস্ময়ে বলিস কী, বলিস কী বলতে বলতে বসার ঘরে গিয়ে ঢোকেন।
দেখেন, বয়সে তরুণ, ভারি উজ্জ্বল চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ। সমীর সাহেবকে বাবার বন্ধু অনুমান করে তরুণটি প্রথমে সালামালেকুম বলে তারপর এগিয়ে গিয়ে পা ছোঁবার জন্য ঝুঁকে পড়ে।
থাক থাক বাবা, হয়েছে বলে সমীর হোসেন বন্ধু পুত্রের দু'বাহু ধরে দাঁড় করান। তারপর জানতে চান, তুমি কবে এসেছো? কোনো খবর টবর দেয়নি কেন গোপাল? তুমি যে ঢাকায় আসবে আমাকে জানাবে না?
আপনার ঠিকানা তো বাবা জানেন না, ফোন নাম্বারও না, বহু কষ্টে আমি একটা ফোন নাম্বার জোড়া করেছিলাম। সেই নাম্বারে ফোন করলে বুঝলাম ওটা খবরের কাগজের অফিস নাম্বার যে কাগজে আগে আপনি কাজ করতেন আমি অনুরোধ করেছিলাম আপনার নাম্বারটা দেওয়ার জন্য, তো ভদ্রলোক বললেন যে আপনার নাম্বার, তার জানা নেই। তবু আমি বলে এলাম ভেবেছি খুঁজে নিশ্চয়ই বের করতে পারবো- তো কলকাতায়। মানে দমদম এয়াপোর্টেই পেয়ে গেলাম-সেই ভদ্রলোকও জার্নালিস্ট, সুবিমল দেবনাথ, চিকিৎসা শেষে মাকে নিয়ে ঢাকায় ফিরছিলেন, একই পেস্নন-এ ঢাকায় এসেছি, সুবিমল বাবু বললেন, একই কাগজে আপনারা কাজ করেন। বেশ অনেকদিন ধরে ওর কাছে থেকেই ফোন নাম্বার ঠিকানা সবই পেয়ে গেলাম ।
তো সুবিমল বাবু তো নিশ্চয়ই আপনার কলিগ, তাই না?
হ্যাঁ, ও নিউজ-এ আছে। বছর তিনেক হলো ইস্ট হাইজেন এ জয়েন করেছে- তা তুমি এখন কলকাতা থেকে আসছো?
আজ্ঞে হ্যাঁ?
শব্দ দুটো উচ্চারণ করেই দাঁত দিয়ে জিভ কাটে ছেলে। তারপর বিব্রত ভঙ্গিতে বলে, আমার কাকা জ্যাঠারা তো কলকাতাতেই সেটল করেছেন। সেই পার্টিশনের পরপরই বগুড়া থেকে চলে যান।
হ্যাঁ, সমীর হোসেনের মনে পড়ে। বলেন, তবে পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে নয়, কিছুদিন পর, সম্ভবত চুয়ান্নো সালে।
অভিলাষ হাসে। বলে, আমি ঠিক জানি না আংকেল, কীভাবে জানবো? সবই তো আমার শোনা, আমার বাবা কাকারা সবাই তখন ছেলেমানুষ।
হ্যাঁ সমীর স্মরণ করতে পারেন। বলেন, আমরা তখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম।
তো ঢাকায় কেন? শুধুই বেড়াতে?
কলকাতায় আগেও এসেছি। যতোবার এসেছি ততোবারই বাংলাদেশে আসার খুব ইচ্ছা হতো, অভিলাষ বলে, দেখতে ইচ্ছ করতো, বগুড়া, মানে আমাদের এ্যানসেন্ট্রাল হোম-এর জায়গাটা কেমন, ওখানকার মানুষরা কেমন, বাবার মুখে শুনেছি, ওখানে নাকি থ্রি হানড্রেড-এর বেশি পুরনো সভ্যতার রেমন্যান্টস এখনো আছে আরও কিছু হয়তো অভিলাষ বলতো, কিন্' তার আগেই রানী বলে ওঠে, বাবা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা

http://doridro.com

বলবে নাকি?
সে চোখের ইশারা ডাইনিং টেবিলটা দেখায়।
ও হ্যাঁ হ্যাঁ, সমীর হোসেন-এর যেন হুশ হয়। মেয়ের ওই কথার পর তিনি অভিলাষের ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, চলো, আমাদের সঙ্গে বসবে, ওখানে কিছু নাস্তা করবে আর কি-
কথা বলতে গিয়েই থেমে যান সমীর সাহেব। অপ্রস্ত হয়ে হাসতে হাসতে বলেন, আমারও তো ভুল হচ্ছে- নাস্তা মানে সকালের জলখাবার আর কী।
অভিলাষও হেসে ওঠে। বলে নাস্তা এখন কলকাতাতেও চালু হয়ে গেছে চাচা-ইয়ং ছেলেমেয়েরা নাস্তা বলে, আর ননবেঙ্গলীরা তো বলেই, লণ্ডনের ইন্ডিয়ানরাও একই রকম-
তো চলো, সমীর বন্ধুর ছেলের ঘাড়ে হাত রেখে সামনের দিকে পা বাড়ান।
তখন অভিলাষ বলে, আমি কিন্ত' এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে এসেছি।
ও রানী এবার যেন কথা বলার সুযোগ পায়। বলে তার মানে মুখ হাত ধোয়াটোয়া হয়নি, এই তো?
হ্যাঁ আপনি ঠিক ধরেছেন। অভিলাষ হাসতে হাসতে রানীর মুখের দিকে তাকায়।
কোনো অসুবিধা নেই রানীর মুখ দিয়ে শব্দ তিনটা বেরন্নতে বেরন্নতে সে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের হ্যাংগারে ঝুলন্ত তোয়ালে খানা টেনে নিয়ে অভিলাষের হাতে দিয়ে বারান্দার বেসিনটা দেখিয়ে দেয়।
টেবিলে বসে অভিলাষ খুশি হয়। বলে, লুচি আর আলুর ডালনা। বাহ!
মোহন ভোগও আছে। রানী হালুয়ার পেস্নটটা দেখিয়ে দেয়।
মোহন ভোগ। অভিলাষ ঠিক যেন বুঝতে পারে না।
বাহ হালুয়াকে আপনারা মোহনভোগ বলেন না? রানী স্মরণ করিয়ে দিতে চায়।
হ্যাঁ অভিলাষ অতীতের কথা স্মরণ করতে করতে বলে, মায়ের মুখে বোধহয় শুনেছিলাম শব্দটা তবে হালুয়া রেগুলার হতো না, লুচি ও ডালনা প্রায়ই হতো, মা যতোদিন বেঁচেছিলেন
সেকি? সমীর হোসেন চমকে ওঠেন। তারপর চুপ হয়ে যায়। সবাই। শেষে সমীর হোসেনই নীরবতা ভাঙ্গেন।
জানতে চান তা কবে? কতোদিন হলো?
তা বেশ কিছুদিন, অভিলাষ মনে মনে বোধহয় হিসেব করে। তারপর বলে, তা বছর সাতেক হবে।
ভাইবোন? রানী কৌতূহলী হয়।
আমি আর আমার বড় বোন মাধবী, ওর বিয়ে হয়ে গেছে।
তার মানে বাড়ি খালি, শুধু তোমার বাবা? সমীর হোসেন একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলেন।
ওই মন্তব্য শুনেই সম্ভবত অভিলাষ মাথা নিচু করে। সেটা সমীর হোসেনের নজর এড়ায় না বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলতে ছেলেটি বিব্রত বোধ করছে। তাই বলে ওঠেন এখন থাক এসব আলাপ পরে এক সময় এসব নিয়ে কথা বলা যাবে।
না চাচা অভিলাষ মুখ তুলে বলে, থাকবে কেন, এখন তো আলাপ করছি না আমরা, শুধু খবরা-খবর নিচ্ছেন আপনি। আর এটা তো একটা খবরই অন্যকিছু নয়, খবরটাও খুব সিম্পল মা মারা যাবার এক বছর পর আমার বাবা একজন সুইডিশ বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছেন-তাই এখন বাড়ি খালি থাকে না।
কথাটা বলেই সে রানী মুখের দিকে তাকায়।
বাহ বেশ ভালো তো রানী সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে, ওয়ান মাম্মী গন, এ্যানাদার কেম ইন-আপনি খুব লাকি আহা আমার কপাল যদি অমন হতো! রানী বাবার মুখের দিকে সকৌতুক চোখ মেলে তাকায়।
এ্যাই, চুপ কর। সমীর হোসেন মেয়েকে ধমকে ওঠেন। এটা কি হাসি ঠাট্টা করার জায়গা নাকি। তোর কি কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই।
রানী ধমক খেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, সরি বাবা, আই'ম সরি।
ঐভাবে রানী মাফ চাওয়ার পর আর কথা হয় না। চুপচাপ নাস্তা খায় সবাই।
অভিলাষের পাতে খাবার তুলে দেন সমীর হোসেন নিজের হাতে- লুচি তরকারির পাশে হালুয়াও দেন। এবং

http://doridro.com

সবই খেয়ে নেয় তার বন্ধুর ছেলে, তার ভাব দেখে মনে হয় আরও দিলে আরও খাবে কিন্' টেবিলে যা দেওয়া হয়েছিলো তার কিছুই তখন বাকি ছিল না।
খাবার টেবিল থেকে উঠে আবার সবাই বসার ঘরে এসে বসে। সবাই চুপচাপ, কিউই কথা বলছে না দেখে রানীর বোধহয় খারাপ লাগে, সে আবার খুনসুটি আরম্ভ করে। সে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা অভিলাষ বাবু, আপনার কি একটাই নাম? মানে আমি অভিলাষ সেন নামটার কথা বলছি, ওটাকে কেউ ছোট করেনি কখনো? আপনার মাও কি আদর করে কোনো ছোটখাটো নামে আপনাকে ডাকতেন না?
অভিলাষের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মেয়েটি আবার খুনসুটি আরম্ভ করতে চাইছে। তাই সে হাসতে হাসতে পাল্টা জিজ্ঞেস করে আপনি কি মায়ের আদর করে দেওয়া নামটা জানতে চান? কিন্' কেন?
না মানে আপনার নামটা বেজায় বড় তো-তাই রানী এমন ভঙ্গি দেখায়, যেন সে মহাসমস্যায় পড়েছে।
কী করবেন, ওই বড় বা লম্বা যাই বলনু, ওই নামেই ডাকতে হবে- কারণ লক্ষ্মী তো একজন দেবী, নারী দেবতা, কোনো পুরম্নষ মানুষকে নারী নামে ডাকা কি ঠিক হবে? আর যদি শুধু কান্ত বলে কেউ ডাকে, তাও ঠিক হবে না, কেননা কান্ত মানে তো প্রেমিক বা স্বামী, কোনো মেয়েকি ঐ নামে ডাকতে পারবে? তাই ডাকতে হলে পুরো নাম মানে লক্ষ্মীকান্ত বলেই ডাকতে হবে।
তাহলে আপনার নামটাকে ছোট করা যাবে না? রানী মুখোমুখি তাকায়।
হ্যাঁ তাই তো বোঝা যাচ্ছে, অভিলাষ হাসতে হাসতে বলে।
তাহলে আমার মুখ দিয়ে অভিলাষ না বেরিয়ে ভুলক্রমে অভিশাপ শব্দটা বেরিয়ে যায়। রানী ভুরম্ন বাঁকিয়ে তাকায়। যদি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় তো যাবে, অভিলাষ বলে, বুঝে নেবো, ওটাই আমার কপাল, তবে এখানে একটা কথা আছে অভিলাষ আবার বলে, মানুষের নাম দেওয়া হয় তো, তাকে ডাকবার জন্য, মানে নাম ধরে ডেকে তাকে কাছে আনা হয় আর অভিশাপ মানে তো দুরে ঠেলে দেওয়া এখন আমাকে অভিলাষ নামে না ডেকে যদি অভিশাপ বলে ডাকতে আরম্ভ করে কেউ, তাহলে কী বঝুবো আমি? বলুন? কাছে আসবো, না দূর থেকেই গাল দিতে দিতে পালাবো।
হয়েছে হয়েছে অনেক পন্ডিতী করতে পারেন। তা বুঝেছি, এবার ঘরে অন্য কথা বলুন।
সমীর হোসেন প্রথম সাৰাতেই বন্ধু পুত্রের কথাবার্তা শুনে একেবারে মোহিত হয়ে যান। ছেলেটার জানাশোনার জগতটা যে বেশ বিস্তৃত তা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না।
প্রথম সাৰাৎ প্রথম আলাপ আর প্রথম আতিথেয়তা তবু অভিলাষ সেন বাবার বন্ধুর আচরণে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়। সেও তার মনের দুয়ার হাট করে খুলে দিয়েছে তখন। তার মা যে আদর করে তাকে মিঠু বলে ডাকতেন, তাও তার মুখ দিয়ে যে কখন বেরিয়ে গেছে সে টের পায়নি। তবে সে যে অতিথি বই অন্য কেউ নয়, সেই টনটনে জ্ঞানটা তার হারায়নি। ঘড়ির দিকে চোখ পড়লে সে ওঠে। বলে, চাচা আমি এখনকার মতো উঠি। পরে আবার আসবো ঢাকায় কয়েকদিন থাকবো বলে এসেছি। হিস্টোরিক্যাল জায়গাগুলো দেখার খুব ইচ্ছে আমার-
কী দেখবেন? নবাববাড়ি, রানী এবার চোখে চোখে তাকায়।
না শুধু নবাববাড়ি নয়, মিঠু বলে, আমি দেখতে চাই সেই আমতলা, যেখানে ছাত্ররা জমায়েত হয়ে মিটিং করেছিল যে মিটিং এ সরকারের আইনভেঙ্গে মিছিল বের করা হয়। মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলা সেই মিছিলে গুলি চললে ছাত্র আর সাধারণ মানুষ শহীদ হয় যেখানে যেখানে গুলি চলে আর ছাত্র জনতা শহীদ হয়, সেই জায়গাগুলো দেখার বড় সাধ আমার-রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন যারা অর্গানাইজ করেছিলেন, যারা লীডারশিপ দিয়েছিলেন, যারা পার্টিসপেট করেছিলেন। তারা অনেকে বেঁচে আছেন, আমি ওদের সঙ্গে দেখা করবো।
কেন বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবে না? সমীর হোসেন জিজ্ঞেস না করে পারেন না।
হ্যাঁ তা ও নেবো, তবে প্রাইমারিলি ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারটা আমার কাছে বেশি গুরম্নত্বপূর্ণ বলে মনে হয়-মনে হয় হিস্ট্রির একটা নতুন চ্যাপ্টার যেন শুরম্ন হয়েছে একেবারে ইউনিক একটা ঘটনা, অনেক দেশের

http://doridro.com

মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীনতা অর্জনও করেছে- কিন্' ন্যাশনাল ল্যাংগোয়েজের জন্য লাইফ স্যাক্রিফাইস? এমন ইন্সট্যান্স কয়টা আছে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে, বলুন? এখন ২১শে ফেব্রম্নয়ারী মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে হিসেবে অবজার্ভ করা হয় ওয়ার্ল্ডওভার, এটা কি সোজা কথা? বলুন? তাই আমি আগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি খোঁজখবর নিতে চাই-
মিঠু অনেক কথা বলে, একটু থামে, তারপর বলে, এবার আমি যাই কাকা। সে দরজার দিকে পা বাড়ায়।
রানী ওই সময় পেছন থেকে বলে, আচ্ছা আপনার কথার কিছু ঠিক থাকে না কেন মিঠু বাবু?
রানীর কথা শুনে মিঠু দাঁড়িয়ে পড়ে। পেছনে তাকিয়ে দেখে রানী মুখ টিপে হাসছে আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে অবাক হয়ে বলে, এসব আপনি কি বলছেন? আমার কোন কথাটা ঠিক নেই?
এবার রানী গম্ভীর ভাব আনে মুখে। বলে, কখন কী বলছেন, কাকে কী বলছেন তার ঠিক নেই।
কী ঠিক নেই? বলবেন তো। মিঠু ভুরম্ন কুচকে চোখে চোখে তাকায়। বাহ তাও বুঝতে পারেন না। বাবার বন্ধুকে একবার বললেন আংকেল, তারপর বললেন চাচা, আবার একটু আগে বললেন কাকা- তো কী বুঝবো? আপনার কথার ঠিক আছে?
রানীর কথার প্যাঁচে মিঠু ধরা পড়ে অপ্রস্ত হয়ে যায় আর ক্যাবলার মতো হাসে। তবে দমে যায় না একেবারে। সমীর হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, চাচা আপনার মেয়ে দেখছি দারম্নন খুঁৎখুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খালি খুঁৎ ধরে- এবার আমি যাই। এখানে থাকলে খালি খুৎ ধরবে।
সমীর প্রসন্ন মনে হাসেন। গোপালের ছেলে গোপালের মতোই হয়েছে। যেমন উদার তেমন হৃদয়বান , আবার হাসিখুশিও।
ছেলেটা দরজায় দিকে পা বাড়ালে সমীর ডেকে ওঠেন, এই মিঠু তুমি কোথায় যাচ্ছো?
মিঠু ঘুরে দাঁড়ায়। সে কিছু বলার আগেই সমীর হোসেন জিজ্ঞেস করেন, তুমি এখন কোথায় যাবে, উঠেছো কোথাও।
এখনো কোথাও উঠিনি। বললাম না তখন যে আমি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা এখানে এসেছি- তবে এখন উঠবো, মিঠু জানায়। বলে- কলকাতায় ট্রাভেল এজেন্সি থেকে একটা হোটেলের নাম ঠিকানা দিয়েছে সুন্দরবন হোটেল ওখানেই আপাতত যাচ্ছি-
রানী ভ্রূকুঁচকে মিঠুর কথা শুনতে শুনতে বলে ওঠে, কেন হোটেলে কেন? হোটেলেই যদি উঠবেন তো বাবার বন্ধুর বাড়িতে প্রথমেই কেন এসেছেন? ঢং দেখাতে তাই না?
দুজনের মধ্যে ছেলে মানুষী ঝগড়া হবার উপক্রম হওয়াতে সমীর হোসেন বলে ওঠেন- শোনো মিঠু, হোটেলে যাবার কী দরকার?
আমার এখানেই তো জায়গা আছে। মনে হয় না খুব একটা অসুবিধা হতে তোমার।
অমন কথা শোনার পরও মিঠু সহজ হতে পারে না। কেমন একটা ইতস্তত ভাব তার মধ্যে ফুটে ওঠে।
ঠিক আছে, যান তাহলে। রানী বলে, এখানে মনে হচ্ছে আপনার অসুবিধাই হবে।
কিসের অসুবিধা? সমীর হোসেন বুঝতে পারেন না।
বাহ বিলেতে মানুষ হওয়া ছেলে, হয়তো হুইস্কি ওয়াইন খাবার অভ্যেস আছে এখানে তো ওসব জিনিস খাবার উপায় কোথায়? পাওয়া গেলে তো খাবে-
রানীর কথা শুনে মিঠুর চেহারা কিছুটা যেন পাল্টে যায়, দেখে মনে হয়, খুব যেন আঘাত লেগেছে মনে -
রানী আবার বলে, আপনি যদি সঙ্গে এনে থাকেন। তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না-
এ্যাই চোপ। এবার সত্যি সত্যি মেয়েকে ধমক লাগান সমীর হোসেন। বলেন, যা মুখে আসে তাই বলে যাবি? তুই কি ভদ্রভাবে কথাও বলতে পারিস না। আজ ও আমাদের এখানে প্রথম এসেছে, আর তুই এভাবে যা খুশি তাই-
আইম সরি মিঠু বাবু। আইম সরি, রানী মাপচাওয়ার ভঙ্গি করে বলে আমার ভুল হয়ে গেছে-
ওইভাবে মাপ চেয়েই সে পিছনের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

http://doridro.com

সমীর হোসেন এগিয়ে গিয়ে মিঠুর হাত ধরেন। বলেন, তুমি কেন যাচ্ছো বলো তো? বললাম তো, এখানে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না- নিজেদের বাড়িতে থাকার মতোই থাকবে- রানী একটু বেশি কথা বলে, ওই যা একটু জ্বালাবে- তাছাড়া ভালোই লাগবে তোমার। অন্তত দুটো দিন থেকে যাও আমাদের সঙ্গে ভালো না লাগল তখন চলে যেও-

মিঠু দোটানায় পড়ে যায়। একবার ভাবে থেকে যায়, আবার মনে হয়- কেন এদের ওপর বোঝা হতে যাবে সে।

তাছাড়া অন্য একটা দিকের কথাও তার মনে আসে। ঢাকার সাধারণ হোটেলে থাকার কী রকম ব্যবস্থা তা তো সে জানে না। শুনেছে কলকাতার সাধারণ হোটেলের মতোই। পাঁচতারা হোটেলে তো সে যাচ্ছে না। কলকাতার সাধারণ হোটলের মতো যদি এখানকার হোটেলও হয়। তাহলে স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে সে যে থাকতে পারবে তাও তার মনে হয় না। আর যদি সে এভাবে সমীর কাকার কথা উপেৰা করে যায়, সেটাও কি ভালো কাজ হবে?

রীতিমতো দোটানায় পড়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবে কি যাবে না তাই নিয়ে ভাবে।

আর ওই সময় পাশের ঘরের দরজা ঠেলে আবার বসার ঘরে আসে রানী। এসেই পাশে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন মিঠু বাবুল দেখবেন এ বাড়ির ঘর বিছানা পছন্দ হয় কি না।

কথাটা বলেই সে মিঠুর ঘাড় থেকে ব্যাগটা নামিয়ে নেয়। তারপর পাশের ঘরে দিকে পা রেখে বলে, আসুন দেখে নিন যদি পছন্দ না হয় তাহলে দরজা খোলাই আছে চলে যাবেন।

রানীর ওই কাণ্ড দেখার পর মিঠুর অন্য কিছু ভাবার কিংবা করার থাকে না। সে রানীর পেছনে পেছনে দরজা পেরিয়ে পাশের ঘরে ঢোকে।

ঘরের ভেতরটা দেখে, চারদিকে নজর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দেখতেই থাকে। ঘরখানা আশাতীত রকমের ভালো বলে মনে হয় তার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মেঝে আর দেয়াল ছাদ, পরিপাটি বিছানা টেবিল চেয়ার, একপাশে দেয়াল ঘেঁষে দু'দুটো বুক সেলফ। পরনের কাপড় ঝোলাবার জন্য একটা হ্যাংগারও আছে। মাথার ওপর ফ্যান যেমন আছে তেমনি বুক সেলফের ওপর একটা টিভিও রাখা আছে।

রানী বলে, যায় এটা আমার ভাইয়ার ঘর সবসময় গুছিয়ে রাখা হয়। প্রায়ই টেলিফোনে জানায় আমি খুব শিগগিরই আনছি কিন্' আসে না। প্রথমে জাপানে গিয়েছিল সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়া, সেখান থেকে কানাডায়, কিন্' সেখানেও থাকেনি। এখন চলে গেছে ইউএসএ তো ইস্টকোষ্ট এ আরিজোনায় ওখানেই নাকি কাজ পেয়েছে একদিকে মরম্নভূমি আর অন্যদিকে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন ওর সাবজেস্ট তো জিওলজি। ছাত্র যে খুব ভালো ছিলো তা বলা যাবে না। মিডিওকার, কিন্' হলে কী হবেন ভীষণ গোঁয়ার। যদি কোনো কাজ ধরে তো সেটা শেষ না করে ছাড়ে না।

ওই পর্যন্ত বলে রানী থামে। তার খেয়াল হয় যে নিজের ভাই সম্পর্কে সে বোধহয় বেশি কথা বলতে শুরম্ন করেছে। সে তখন অন্য কথায় চলে যায়। বলে দুপুরে কী খাবেন?

মিঠু বিছানায় বসে পড়ে বলে, যা রান্না হয়েছে মানে আপনারা যা খাবেন, তাই খাবো। আমার কোনো চয়েজ নেই।

এটা মুসলমানের বাড়ি তা মনে আছে তো? নাকি ভুলে গেছেন, গরম্নর গোস্ত খাবেন? রানী আড়চোখে মিঠুর মুখের দিকে তাকায়।

গরম্নর গোস্ত মানে তো বীফ, তাই না? মিঠু বলে, হ্যাঁ খাবো মিঠু নির্বিকার ভাবে বলে।

আপনাদের বাড়িতে মানে লন্ডনের বাড়িতে কি বীফ রান্না হয়?

রানীর প্রশ্ন শুনে মিঠু হাসে। বলে, এসব কথা জিজ্ঞেস করতে আপনার খুব মজা লাগে, তাই না?

এতে আবার মজা লাগার কী হলো? রানী অবাক হয়ে মিঠুর মুখের দিকে তাকায়।

বাহ্ মজা না লাগলে ওভাবে খোটা দিয়ে কথা বলেন কেন? মিঠু বলে, কাকা বললাম, না চাচা বললাম, বীফ খাবো কি খাবো না, জ্বি বলছি না, আজ্ঞে বলছি-তা শোনার জন্য মনে হয় কান পেতে রাখেন আমার কথায়

http://doridro.com

খুঁত ধরার জন্য।
মিঠুর মুখে অমন কথা শুনে, রানী দাঁতে জিভ কেটে মাফ চায়। বলে সরি মিঠু বাবু, আর অমন ভুল হবে না। আবার আমি মাফ চাইছি।
রানীর মাফ চাওয়ার ভঙ্গি দেখে মিটুর হাসি পায় আর মনে মনে মেলাতে চেষ্টা করে লন্ডনে প্রবাসী বাঙালি পরিবাররের মেয়েদের সঙ্গে। হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে তো মেলারে পারে না, এমনকি মুসলমান মেয়েদের সঙ্গেও না। বেশবাসে না আচার আচরণে না। কথাবার্তায় না। ওখানে তো দুটি বাঙালি মুসলিম পরিবারের সঙ্গে অনেকদিন ধরে তাদের জানাশোনা, ওই দুই পরিবারের দুটি মেয়েই তার বান্ধবীর মতো একই স্কুলে পড়েছে- জুবাইদা গুলশান আর নিশাত মেহরিন। ওরা কাপড়ে চোপড়ে অনেক বেশি পশ্চিমা রীতি রেওয়াজ অনুসরণ করে। ওদের পরনে কখনো শাড়ি দেখেছে বলে তার মনে পড়ে না, সালোয়ার কামিজ ওড়না পরতে দেখা যায় তবে কদাচিত। প্যান্ট শার্ট নয় তো স্কার্ট ওদের পরনে থাকে। চুড়িটুড়ি হাতে থাকে না শুধু দুই কানে কখনো কখনো রিং দেখা যায়। বাংলা পড়তে তো পারেই না, এমন কি বাংলা উচ্চারণও ঠিকমতো করে না। রানীর মতো অনর্গল কথা বলার মতো বিরক্তিকর আচরণ ওদের নেই কিন্' তা হলে কী হবে, ওদের সঙ্গে সে কখনো আন্তরিক হতে পেরেছে বলে তার মনে হয় না। অথচ রানীর সঙ্গে কয়েক ঘন্টার মাত্র পরিচয়, তবু খুবই মন খুলে আন্তরিকভাবে কথা বলতে পারছে বলে তার মনে হয়।
রানীর মুখের দিকে তাকালে সে বলে ওঠে। কী হলো, বলেন না কেন, দুপুরের লাঞ্চে কী খাবেন।
মিঠু হাসে। বলে, বললাম তো, এককথা কতোবার বলতে হবে?
রানী স্মরণ করতে চেষ্টা করে। কী বলেছে মিঠু। কিন্' স্মরণ করতে পারে না ঠিকমতো। সে বুঝে নেয় ছেলেটা তার সঙ্গে চালাকি শুরন্ন করেছে। সে তখন বলে শুঁটকির ভর্তা খেয়েছো কখনো?
ও নো। মিঠুর নাকমুখ কুঁচকে ওঠে। বলে বিচ্ছিরি গন্ধ আপনারা আইমীন বাংলাদেশের লোকেরা এই আইটেমটা কেন যে আপনাদের খাবার মেনুতে রেখেছেন আমি বুঝতে পারি না দ্য স্মেল ইজ ভেরি এ্যাস্টি ন্যান্ড ডিসগাসন্টিং
রানী চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, ওই শুঁটকিই খেতে হবে। যদি বাংলাদেশে থাকেন
একটু পর রানী আবার বলে, আরও কী খেতে হবে জানেন?
কী খেতে হবে, আপনিই বলুন, মিঠু রানীর মুখোমুখি তাকায়। রানী বলে, গরন্ন ছাগলের উজুরি চেনেন? ওই উজুরি খেতে হবে।
মিঠুর ভুরন্ন কুঁচকে ওঠে। বলে উজুরি আবার কী?
এনটেইলস, রানী বুঝিয়ে বলে, এনটেইলস অফ কাউজ এ্যান্ড গোটস। সহজ বাংলায় বলে নাড়িভুঁড়ি স্টমাক এ্যান্ড ইনটেস্টাইন্স।
ছি ছি এসব কী বলছেন? মিঠুর চোখে-মুখে ঘেন্না উপচে ওঠে। বলে, হাউ ক্যান হিউম্যান ইটিং টেক দোজ ন্যাস্টি থিংস।
ইউ ডোন্ট নো মিঠু বাবু, হোয়াট এ ডিসিশান ডিশ দোজ থিংস মেক।
ওহ নো, ইন নো কেস, মিঠু আবার নাক-মুখ কুঁচকে বলে।
তাহলে এবার বলুন, রানী আবার হাসে। বলে নাউ বি এ গুড বয়, টেল মি হোয়াট উড ইউ লাইক ইন দ্য লাঞ্চ।
কেন? মিঠু সহজ ভঙ্গিতে বলে, ফিশ চিকেন এ্যান্ড ভেজিটেবলস।
নো রাইস? রানী চোখে চোখে তাকায়।
অফকোর্স, দেয়ার মাস্ট বি রাইস, হোয়াই ডু ইউ ফরগেট দ্যাট আই'ম এ বাঙালি, এ্যান্ড নাউ আই'ম ইন বাংলাদেশ।
ঠিক আছে, রানী সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবার মতো বলে, এবার কাপড় চোপড় বদলান, বী কম্ফোটেবল, তারপর বিশ্রাম নিন। রাতে ঘুমিয়েছিলেন তো?

হ্যা হয়েছে ঘুম মিঠু বলে, কিন্' ভালো মতো নয়, এয়ারপোর্টে রওনা হবার জন্য মাঝরাতেই বিছানা থেকে উঠতে হয়েছিলো। তাহলে আর কথা নয়, রানী অভিভাবকের মতো বলে, হ্যাভ ইয়োর বাথ ফার্স্ট, বী ফ্রেশ, দেন টেক রেস্ট, আই'ল কল ইউ ফর লাঞ্চ। সো এ্যাট ওয়ান ও ক্লক এ কাপল অফ আওয়ার্স লেটার ওকে, দেন বাই।

মিঠুকে ঘরে রেখে রানী বেরিয়ে যায়। মিঠু প্রথমে টান টান হয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। আর চিন্তা করে এটা তার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশে আসা যেমন তেমনি একটি মুসলিম পরিবারের অতিথি হওয়া। ইস্ট লন্ডনের বেশ কয়েকটি ফ্যামিলির সঙ্গে তার জানাশোনা ছিলো- সবাই ছিলো স্কুলের বন্ধু। স্কুল ছাড়ার পর আর যোগাযোগ রাখতে পারেনি। এখন খোঁজ করেও ওদের কোনো হদিস বের করতে পারে না। তবে হিন্দু বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো স্কুলের পড়া শেষ হবার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত টেলিফোনে কথাবার্তাও হতো। ওরা ওই মুসলিম ক্লাসমেটদের সম্বন্ধে কিছুই বলতো না। আসলে ওরা ওদের পছন্দই করতে না। বলতো, ওরা তো আনকালচার্ড, আনএডুকেটেড, নিউকামারইন দিস কান্ট্রি- ওদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, সবই রাস্টিক। ওরা নোংরা জিনিসও খায়, ওদের সঙ্গে আমরা কীভাবে বন্ধুত্ব করতে পারি? অভিলাষ ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতো বলে তাকেও পছন্দ করতো না। তবু যোগাযোগটা ছিলো যতোদিন ওই ইস্ট লন্ডনের ভাড়াটে বাড়িতে ছিলো পরে যখন কেন্ট এলাকার ব্রসলিতে নিজেদের বাড়িতে চলে আসে তখন থেকে আর যোগাযোগ নেই। সে যোগাযোগ করলেও সাড়া পায় না। তবে সবই সেই ছেলেবেলার কথা, যার আরম্ভ যখন সে সিক্সথ গ্রেড বা সেভেন্থ গ্রেডের ছাত্র। পরে অবশ্যি অমন ধরনের কথা শোনেনি। তবে রানী যা বললো, যতো হাসি-ঠাট্টার ছলেই বলুক, ব্যাপারটা আসলেই চিন্তার বিষয়- রন্নচি আর অভ্যাসের ব্যাপারে তো একটা সামঞ্জস্য থাকা দরকার। শুঁটকি মাছ খায়, সেটা না হয় টলারেট করা যায়, কিন্' নাড়িভুঁড়ি খাওয়ার ব্যাপারটা কীভাবে মেলানো যাবে? উহু সেটা অসম্ভব।

তার মনে হয় রানী তাকে ভয় দেখাবার জন্য অমন উদ্ভট কথা বলেছে। আবার এও মনে হয় ভয় দেখাবার জন্যই যদি বলবে, তাহলে অমন আন্তরিকতার সঙ্গে এ বাড়িতেই থাকতে বলবে কেন?

এলোমেলো চিন্তা করতে করতে একসময় সে নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ে। তবে বেশিৰণ নয়, আজানের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আজানের ধ্বনিটা তার চেনা হয়ে গেছে। কলকাতায় পার্ক সার্কাসে গুদাম কাকাদের বাড়ির কাছেই একটা পুরনো মসজিদ আছে। যতোদিন ছিলো, তার প্রায় প্রত্যেকদিনই সে আজান শুনেছে। দুপুর বেলার আজান মানে একটা বাজে এখন। তার মানে সে ঘন্টাদেড়েক ঘুমিয়েছে। তার অনুমান হয় এৰুণি রানী তাকে ডাকতে আসবে। তাই তার উচিত হবে, স্নান টান সেরে নেওয়া।

তার ব্যাগ-স্যুটকেসের ভেতরকার জিনিসপত্র ভালোভাবেই সাজানো ছিলো। তাই স্নান শেষের কাপড় চোপড় বের করে নিতে দু'মিনিটও লাগে না। ঘরে পরে থাকার িপার জোড়াও সে কাপড়-জামার সঙ্গেই বের করে নেয়।

তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার স্নান শেষ হয়ে যায়। আর তখন ভেবে পায় না, তার ব্যবহার করা কাপড়-চোপড়গুলোর কী হবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তাই বাথরন্নমের দেয়ালের রডে ও সব কাপড় ঝুলিয়ে রাখে। দেয়ালেই আয়না চিরন্ননি পায় তাই চুলটুল আঁচড়ে নিয়েই সে বাথরন্নম থেকে বের হয়।

আর বেরিয়েই রানীর মুখোমুখি পড়ে যায়। দেখে রানী টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছে। মিঠুকে বেরন্নতে দেখে সে নিরবে হাসে। কোনো কথা বলে না মিঠুর সঙ্গে। চেয়ারে বসেই কাজের মেয়ে মজিলাকে ডাকে। মহিলা এলে তাকে বাথরন্নমে রাখা মিঠুর কাপড়গুলো নিয়ে যেতে বলে। তারপর চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় মিঠুর দিকে একবারের জন্যও ফিরে তাকায় না।

ওই সময় দেয়াল ঘেঁষে রাখা বইভর্তি বুককেস দুটো দিকে মিঠুর নজর যায়। তাকে তাকে সাজানো বইগুলোর পিঠে ছাপানো বইয়ের নাম আর লেখকের নামগুলো সে ঝুঁকে পড়ে একটা একটা করে দেখে। রবীন্দ্রনাথকে পায়, শরৎচন্দ্রকে পায়, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যও দূরে নজর সরাতে হয় না। জনগণমন অধিনায়ক। মনের মধ্যে গুনগুন করে ওঠে। বন্দে মাতরম-এর সুরও কানের কাছে বাজতে থাকে শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি গল্পের

ইংরেজী অনুবাদ পড়েছিলো সেটা মনে পড়ে। বাংলা পড়তে শেখার পর প্রথম উপন্যাস পড়েছিলো দেবদাস, সেই অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ হয়। দুটো তাকে ভর্তি ইংরেজী বই দেখে। কবিতার বইগুলো একজায়গায়, সেখানে কোলরিজ শেলী, কীটস, বায়রন তো দেখেই, এমনকি এলিয়টও দেখতে পায়। লৰ্য করে, কবিতার বইগুলোর সঙ্গে শেক্সপীয়ারের বই নয়, তার বই রাখা হয়েছে নাটকের বইয়ের পাশে। তার ফিকশন এর তাক ভর্তি, কে নেই সেখানে? হেনরি ফিলডিং, জেন অস্টেন, ডিফেন্স, গলসওয়ার্দি, সমারসেট মম, হাওয়ার্ড ফাস্ট, যোসেফ কনরাড, ডিএই লরেন্স, জেমস জয়েস বলতে গেলে প্রায় সবাই। আর এক তাকে খালি অনুবাদ, সব ইংরেজীতে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, রাশিয়ান। তার রীতিমতো অবাক লাগে এরা এতো সাহিত্য পড়ে? এতো সাহিত্যের বই তো ইউকেতে খুব কম মধ্যবিত্ত পরিবারে পাওয়া যাবে। নিজেদের বাড়িতে, তার স্মরণ হয়, বইয়ের কারেকশন কমন নয়। কিন্' এতো সাহিত্যের বই সেখানে নেই।
তাক ভর্তি সাজানো বইগুলো এখন তার মনকে টেনে ধরেছে, ঠিক ওই সময় রানীর ডাক তার কানে আসে। প্রথমে বোধহয় সে সাড়া দেয়নি। যখন সাড়া দিয়ে ভেতরের দিকে গেলো তখন দেখে টেবিলে খাবার সাজানো। সমীর চাচা বসে গেছেন, পাশে রানী দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেৰা করছে।
কী হলো, খাবেন না? রানীর গলায় ধারালো আক্রমণ।
হ্যাঁ এসেছি তো- মিঠু জানায়।
এতো দেরি কেন? রানী বলে, ভয়ের কিছু নেই। আপনাকে উজুরি খেতে দেওয়া হবে না। আমাদের দেখে কি অমন মনে হয় আপনার, যে নিষিদ্ধ খাবার খাইয়ে আপনার ধর্ম নষ্ট করে দেবো?
সমীর ঠিক বুঝতে পারে না রানী কী বলছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন কী বললি তুই? কী খেতে দেওয়া হবে না?
রানী হাসতে হাসতে বলে উজুরি বাবা উজুরি। গরম্ন ছাগলের নাড়িভুঁড়ি পরিষ্কার করে অনেক যে রান্না করে খায়। সেই উজুরি?
কিন্' কেন? সমীর হোসেন মেয়ের মুখের ওপর থেকে নজর সরান না।
এমনি বাবা, রানীর মুখে তখনও হাসি। বলে, ঠাট্টা করে বলেছি। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম দুপুরে লাঞ্চে কী খাবেন? তো উনি বললেন, আমরা যা খাবো তাই নাকি খাবেন। ওর কোনো বাছবিচার নেই। তখন মজা করার জন্য বলেছিলাম ওই উজুরির কথা।
ও ও এই ব্যাপার? সমীর হোসেন হাসেন। বলেন, আমি ভাবলাম কী না কী।
সমীর চাচার পাশাপাশি বসে মিঠু-উল্টোদিকে রানী, মুখোমুখি। ভাত, সবজি, মাছ, মুরগি, সবই রান্না হয়েছে দেখা যায়-সব বোল গামলা পেস্নটে সাজিয়ে রাখা। রানী মিঠুর পাতে খাবার তুলে দিতে গেলে, সে হাত নাড়াতে নাগাতে বলে, ঠিক আছে আমাকে তুলে দিতে হবে না, ফর্মালিটি কেন করছেন। আমি নিজেই তুলে নেবো, যা খেতে ইচ্ছে করবে।
খাওয়া শুরম্ন হলে, সমীর জিজ্ঞেস করেন, কেমন রান্না হয়েছে? খেতে ভালো লাগছে?
হ্যাঁ, এক্সেলেন্ট, মিঠু জানায়। তারপর খেতে খেতে বলে, এসব ডিশ আমার মা রান্না করতেন, ভেজিটেবল, ডাল, মাছের ঝোল, চিকেনও দেখতে একই রকম লাগছে, তবে টেস্ট একটু যেন আলাদা মনে হচ্ছে।
খাওয়া শেষ হলে মিঠু বলে, চাচা আমি একটু বেরম্নবো, আমাকে আপনার ম্যাপটা দেবেন?
ম্যাপ? সমীর অবাক হন। তার কাছে ধাঁধার মতো লাগে। কী চাইছে ছেলেটা? বলেন, কিসের ম্যাপ? ম্যাপ দিয়ে কী করবে?
আমি একটু ঘুরবো টুরবো তো। ঢাকায় তো প্রথম এসেছি তাই ঢাকা সিটির ম্যাপটা সঙ্গে থাকলে মানে আমি টুরিস্ট ম্যাপের কথা বলছি, ম্যাপটা সঙ্গে থাকলে-
আমার কাছে ওসব ম্যাপট্যাপ নেই। আমি জানি না, টুরিস্ট ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে কিনা কারো মুখে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না।
রানী বলে, আপনি কলকাতায় যে ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছেন, ওদের কাছে চাননি কেন?

চেয়েছিলাম, মিঠু বলে, কিন্' ওরা দিতে পারেনি, বলেছে, ঢাকা এয়ারপোর্টে এ জোগাড় করে নিতে-এয়ারপোর্টে খুঁজেছিলাম পাইনি। বাবা মেয়ে দুজনে দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। মেয়ে বলে, বাবা মিঠু বাবু মনে হচ্ছে একদিনে সবকিছু জয় করে নিতে চায়।

মিঠুর কানে যায় না রানীর কথা। সে বলে চলে, এক ভদ্রলোক শেষে বললেন, বইয়ের দোকান থেকে কিনে নিতে, তো জিজ্ঞেস করলাম, বইয়ের দোকানটা কোথায় পাবো? তো দুটো নাম বললো, একটা নাম বললো বাংলাবাজার আর একটা কী যেন সুপার মার্কেট-আর একজন বললো নিউমার্কেটের কথা। তো অতোসব খোঁজাখুঁজি করার কি তখন সময় ছিলো? সুবিমল বাবুর কাছ থেকে পাওয়া আপনার ঠিকানাটা তখন মনে মনে আউড়ে চলেছি। ওই ঠিকানা আওড়াতে আওড়াতে ট্যাক্সিতে চাপি, তারপরও ঠাকুরের নাম জপ করার মতো ঠিকানা জপ করে যাচ্ছিলাম। শেষে আপনাদের এই বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামলে নাম জপও থামলো-ম্যাপের কথা তখন একেবারে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।

ভুলেই যখন গিয়েছিলেন, তাও আবার বেমালুম তখন আবার স্মরণ করতে কেন গেলেন?

মিঠু হাসে। বলে, চিন্তা ভাবনা না থাকলেই তো স্মৃতির দরজা খুলে যায়, সেটা নিশ্চয়ই জানেন-

আপনার তাহলে চিন্তাভাবনা নেই? রানী চোখে চোখে তাকায়।

নাহ। কীভাবে থাকবে। মিঠু হাসতে হাসতে বলে, আরামে থাকার জন্য সুন্দর জায়গা পেয়েছি, কাকার আদর পাচ্ছি, ভালো ভালো খাবার খেতে পাচ্ছি, তাহলে আর চিন্তা-ভাবনা কেমন করে থাকে- তাই পুরনো কথা মনে পড়ছে যেমন, তেমনি নতুন খেয়ালও মাথায় গজাচ্ছে, ভাবছি, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা তো হলো, এবার খোঁরাখুঁরির কাজটা শুরম্ন হোক তাই ম্যাপের খোঁজ করছি-

মিঠু রানীর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলো, সমীর চাচা যে সামনের সোফায় বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন, সে খেয়াল তার হারিয়ে গিয়েছিল। বন্ধু পুত্রের কথা শুনে তার বেশ মজা লাগছিলো। ততৰণে তার লৰ্য করা হয়ে গেছে যে রানী মিঠুর সঙ্গে কথা বলায় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি দুজনের কথায় হাস্যকৌতুকে ছোঁয়াও লাগছে। তিনিও মেয়ে আর বন্ধুপুত্রের কথার মাঝখানে জড়িয়ে নিলেন নিজেকে। বললেন, ঠিক আছে মিঠু আমি কাল অফিসে গিয়ে খোঁজ করবো, যদি ঢাকার ম্যাপ সত্যি সত্যি কেউ বের করে থাকে তাহলে আমি ঠিকই খোঁজ পাবো, আর তোমার জন্য নিয়েও আসবো।

কিন্' চাচা, সে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে, যদি আপনার কাছ থেকে ম্যাপটা পাইও তাহলে তো পাবো আগামীকাল সেই বিকেলে-আজ দুপুর থেকে কাল দুপুর পর্যন্ত কি আমি ঘরের মধ্যে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো?

সমীর হোসেনের মনে ধরে কথাটা। ভাবেন, মিঠুর ৰোভটা তো একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তাই শেষে বলেন, তাহলে তুমি একটু অপেৰা করো, আমি অফিসে টেলিফোন করে জেনে নিই। ইয়ং রিপোর্টারদের মধ্যে কেউ ম্যাপের খবর দিতে পারে কি না। তুমি একটু অপেৰা করো। একা একা বাইরে বেরিও না দিনকাল ভালো নয়। তাতো বোধহয় শুনেছো কিডন্যাপ করে র‌্যানডাম মানি আদায় করে টেররিস্টরা।

সমীর হোসেনের কথা শুনে মিঠু হেসে ওঠে। বলে কী যে বলেন চাচা, আমাকে দেখে কি ধনী লোকের ছেলে বলে মনে হয়? যে টাকার লোভে আমাকে কিডন্যাপ করবে?

কিন্' আপনি যে বিদেশী তা তো বুঝবে? রানী বলে।

কীভাবে বুঝবে, আমার গায়ে কি লেখা আছে যে আমি বৃটিশ সিটিজেন।

তা লেখা নেই, কিন্' যেভাবে আপনি অচেনা জায়গায় চারদিকে তাকাতে তাকাতে পা ফেলবেন, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সামনে পেছনে আর ডাইনে বায়ে তাকাবেন কিংবা রাস্তার লোককে রাস্তার নাম জিজ্ঞেস করবেন, ঠিকানা জানতে চাইবেন, তাতে কে বুঝবে যে আপনি স্থানীয় লোক? আর যখন সন্দেহ করবে যে বাইরে থেকে এসেছেন তখনই আপনার পেছনে লাগবে। শেষে যখন জেনে যাবে যে আপনি বিলেতের মানুষ-ব্যস, তখন কিডন্যাপ করবে।

মিঠু কথা শেষ করতে দেয় না। মাঝখানে বলে ওঠে, আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, তাই না? সে সমীর হোসেনের দিকে তাকায়। বলে, চাচা, আপনার মেয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করুন তো? আমি কিন্' এখনই বেরিয়ে পড়বো-

সমীর হোসেন বন্ধুপুত্রের চেহারায় কী দেখেন, তিনিই জানেন। মেয়েকে বলেন, তুই বড় বেশি কথা বলিস। তারপর মিঠুকে বলেন, তুমি এখন বিশ্রাম নাও। বিকেলে আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো- রাস্তাটা চিনিয়ে দেবো আমাকে ক্লাবে যেতে হবে- ওই এলাকাতেই, ভাষা আন্দোলনের ঘটনাগুলো ঘটেছিলো ওসব জায়গাতেই তো তুমি যাবে, তাই না?

মিঠু সমীর হাসানের কথা শুনে রীতিমতো বিব্রত বোধ করে। তার মনে হয় রানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা তার উচিত হয়নি। সে বলে, ঠিক আছে চাচা, আমার কোনোরকম তাড়া নেই- আপনার সুবিধামত আমাকে নিয়ে যাবেন।

কথা কটা বলেই সে নিজের কামরায় এসে জানালার ধারে দাঁড়ায়। পেছনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে দেখতে পায় গাছও কয়েকটা। তারপরে আবার একটা বাড়ি। সেখানেও গাছ আছে ছোট ও বড়ও। জায়গাটা তার বেশ লাগে। বাড়িগুলো পুরনো, লাল ইটের গাঁথনি, বাইরের দেওয়ালে শ্যাওলা ধরেছে, তবু দেখতে খারাপ লাগে না, আসলে পুরনো জিনিসেরও একটা সৌন্দর্য আছে বলে তার মনে হয়।

সে গাছগুলো দেখে একটা একটা করে। আর মনে মনে ঠিক করে, এখানকার গাছগুলোর নাম সে জেনে নেবে। তারপর মিলিয়ে দেখবে নিশ্চয়ই একই ধরনের গাছ সে কলকাতাতেও দেখতে পাবে- কলকাতা নগর যারা গড়েছে। সেই বৃটিশরা তো এখানকার নগরটাও গড়েছে, যতো কম সময়ের জন্যই হোক প্রাদেশিক রাজধানী তো করা হয়েছিল ঢাকায়। তাছাড়া একটাই তো অঞ্চল ট্রপিক্যাল এরিয়া- স্যামারে বৃষ্টি। স্নো ফল কখনোই হয় না- ফ্লোরা আর ফনায় তাহলে পার্থক্য কেন থাকবে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই তার মনে হয়, সে তো বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে পারে- গাছপালাগুলো কাছ থেকে দেখে আসবে শুধু।

সে কাপড়জামা বদলে বারান্দায় দাঁড়ায়। মজিলা উঠোনোর দড়িতে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলো। তাকে বললো, তুমি দরজাটা বন্ধ করো না, আমি সামনে একটু হাঁটবো শুধু, দূরে যাবো না এক্ষুণি ফিরে আসবো- মজিলা হাসে। বলে-হ, হ, যান না ভাইজান ঘরের ভিতরে কতোক্ষণ বইসা থাকবেন এট্টু ঘুরন-ঘারন ভালো।

দরজার দিকে পা বাড়াতেই রানী এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বাবা তো বললেন, বিকেলে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুবেন।

আমি দূরে কোথাও যাচ্ছি না। মিঠু বলে, এই তো গেটের বাইরের রাস্তাটায় একটু পায়চারি করবো শুধু। যদি রাস্তা ভুলে যান? রানীর তাকানোর ভঙ্গিতে কৌতুক ছলকে ওঠে।

না কেন ভুলবো, মিঠু বলে, আসবার সময় সেই এয়ারপোর্ট থেকে তো ঠিকমতোই চলে এসেছি।

আপনি আসেননি। রানী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, ট্যাক্সিওয়ালা আপনাকে নিয়ে এসেছে।

মিঠু এবার হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো করে বলে, আচ্ছা আপনারা আমাকে একা বাইরে যেতে দিতে চান না কেন? বলুন তো? আমি কি বাচ্চা ছেলে?

হ্যা আপনি তাই, রানী বলে, অচেনা অজানা জায়গায় বুড়ো লোকেরাও বাচ্চা ছেলে হয়ে যায়।

তাহলে কি আমাকে ঘরের ভেতরে বন্দী করে রাখতে চান? লাইক এ প্রিজনার?

না প্রিজনার নয়, রানী মিঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে লাইক এ প্রিন্স- আপনি বাইরে বেরুললে সঙ্গে গার্ড যাবে ফর গাইডেন্স এ্যান্ড সিকিউরিটি।

কিন্' কোথায়? গার্ড কোথায় মিন্টু পেছনে তাকায়।

পিল্লজ ওয়েট জাস্ট ফর এ কাপল অফ মিনিটস, আপনার গার্ড এক্ষুণি এসে যাবে।

সকৌতুকে কথাটা বলেই রানী নিজের কামরার দিকে চলে যায়। ভেতর থেকে সমীর চাচার সঙ্গে কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসে। তার কিছু পরেই রানীকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়- এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে

কাপড় বদলে ফেলেছে এখন পরনে তার হালকা নীল রঙের সূতীর শাড়ি। এক মুখ হাসি উপহার দিয়ে সে বলে, লেটস গো নাউ।
কিন্' আমার গার্ড? মিঠু কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তাকায়।
কেন আমাকে পছন্দ হচ্ছে না?
রানী এমনভাবে শব্দ কটা উচ্চারণ করে যে মিঠু অপ্রস্'ত হয়ে পড়ে। ওই কথার জবাবে কিছুই বলতে পারে না। মাত্র তো কয়েকঘন্টার পরিচয়, কী ভাবে সে বলে যে পছন্দ হচ্ছে, পছন্দ হচ্ছে না, তাই বা কী ভাবে বলে।
অক্টোবরের শেষ, আবার বেলাও পড়ে এসেছে রোদের ঝাঁজও তেমন নেই। দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগোয়। রাস্তায় দু'একজন মানুষ দেখা যায়, রিকশাও একখানা/দু'খানা। পূর্বদিকে হাঁটে ওরা। সামনে বলধা গার্ডেন, গেটের কাছে ভিড় মতো দেখা যায়।
মিঠু ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে বলে, ট্যাক্সিঅলা লোকটা বলেছিলো উয়ারি নাকি ওল্ড সিটির মধ্যে পড়ে, তো এটাই হল ওল্ড সিটি? বাড়িঘর তো কম মনে হচ্ছে তবে অনেক গাছ আছে, হ্যাঁ এইজন্য এলাকাটা বেশ ভালো বলে মনে হচ্ছে।
সামনে চলুন, একটা বাগান দেখবেন রাণী বলে।
বাগান? কিসের, আমের না লিচুর? মিঠু জানতে চায়। বলে আমের? নাকি লিচুর?
আপনি চেনেন? আমগাছ, লিচুগাছ? আপনাদের লন্ডনে আছে?
আরে নাহ ওদেশে কেমন করে থাকবে? নাম শুনেছি মায়ের কাছে তারপর মায়ের সঙ্গে একবার মামাবাড়ি এসেছিলাম বর্ধমানে তখন দেখেছি। তখন ওসব গাছে ফল ছিলো না গাছের ডাল আর গোড়াটা অস্পষ্ট মনে পড়ে কিন্' পাতাগুলো কেমন দেখেছিলাম মনে পড়ে না। ওই বাগানে কি আম লিচুর গাছ আছে?
না, আম লিচুর বাগান নয় এটা, রানী জানায়। বলে, ফুলের বাগানও নয় এটা হর্টিকালচার বাগান- নানান দেশের গাছ এনে এখানে লাগানো হয়েছে- রবীন্দ্রনাথ একবার এই বাগান দেখতে এসেছিলেন।
সে কি? মিঠু অবাক হয়। বলে কেন কী আছে এখানে, এনিথিং স্পেশাল?
রানী বলে, আমি বলতে পারবো না, স্পেশাল কিছু আছে কিনা আমি সব গাছের নাম জানি না।
পাঁচিলের পাশের গাছটার দিকে হাতে তুলে দেখিয়ে বলে, এই গাছটা চিনি এটা মেহগিনি।
আরও কিছুটা হাঁটার পর আর একটা গাছ দেখিয়ে বলে, আর এটা সেগুন।
শাল গাছ নেই? শাল চেনেন না?
না, মা চিনিয়েছেন আমাকে কিছুগাছ ওর সাবজেক্ট ছিলো বোটানি কিন্' যে কথা বলছিলাম, রানী আগের কথায় ফিরে যায়। বলে, শুনেছি রবীন্দ্রনাথ নিজে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এই বাগান সম্পর্কে, বলধা বলে একটা জায়গা আছে ঢাকার কাছেই সাভারের পরে- সেই বলধার জমিদার এই বাগানটা তৈরী করেছেন। বৃৰলতা, ফুল গাছ, ফল গাছ, শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদ, সবই নাকি এখানে চাষ করা হয়েছিল।
বলতে বলতে দুজনে গেটের কাছে এসে যায়। সেখানে একটু ভীড় মতো জমে গেছে। অল্পবয়সী তরম্নণ-তরম্নণীই বেশি। মিঠুর অবাক লাগে। বলে, ইয়ং ছেলে-মেয়েদের গাছপালা নিয়ে এতো ইন্টারেস্ট বাহ বেশ ভালো তো।
রানী জোড়ায় জোড়ায় ছেলে-মেয়েদের কয়েকজনকে দেখে। তাদের চোখে-মুখে যতো না গাছপালা দেখার কৌতূহল, তার চাইতে বেশি প্রণয় সান্নিধ্যের আগ্রহ।
মিঠু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কিছুৰণ তারপর বলে, কই ওদের তো গাছলতা বা ফুলের দিকে নজর নেই, খালি কথা বলছে আর হাঁটছে-
রানী বলে চলুন, এবার ফেরা যাক-
কিন্' একটু ঘুরে দেখবো না। এলামই যখন।
এমনি এমনি ঘোরাঘুরি করে লাভ আছে? বাবার সঙ্গে আসবেন, বাবা অনেক গাছ চেনেন-গাছগুলোর নামও

বলতে পারবেন, আপনি বাবার সঙ্গেই আসবেন।
তা না হয় আসবো, মিঠু বলে, একটু ঘুরে দেখি, এসেই যখন গিয়েছি-আমার তো মজা লাগছে ছেলে মেয়েদের দেখে, মনে হচ্ছে এটা একটা ভালো রাঁদেভু স্পট- রাঁদেভু মানে নিশ্চয়ই জানেন।
জানি, রানী মাথা নিচু রেখেই চলে। সে আবার বলে, আজ থাক মিঠু বাবু চলুন-আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, জরম্নরী কাজ আছে।
মিঠু লৰ্য করে বাঁধানো পুকুরের পাড়ে দুটি তরম্নণ-তরম্নণী গভীর আলাপে মগ্ন, আর রানী ওদের দিকেই বারবার তাকাচ্ছে। সে এক সময় তরম্নণ-তরম্নণী জোড়ার দিকে তাকিয়ে বলে, ওরা তো মনে হচ্ছে অভিসারে এসেছে, আপনি কি চেনেন ওদের?
রানী বলে, না চিনি না, চলুন যাই, পিস্নজ, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।
রানী আড়চোখে আলাপে গভীরভাবে মগ্ন তার দুই সহপাঠীর দিকে তাকিয়ে দেখে বার দুই -তার চিন্তা হয়, যদি একটি ছেলের সঙ্গে সে বলটা গার্ডেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দৃশ্যটা দেখে সামী আর মুনির, তাহলে আর রৰা থাকবে না, ভার্সিটি এলাকায় একেবারে রাষ্ট্র করে দেবে।
আচ্ছা দেখুন একবার? মিঠু হাত তুলে দেখায়। বলে কেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে একজন আরেকজনের হাত ধরেছে-চুমু টুমু খাবে না তো!
ওয়েষ্টার্ন কান্ট্রিতে হলে, এতোৰণে কয়েকবার চুমু খাওয়া খাওয়ী হয়ে যেতো।
রানী ধমকে ওঠে, চুপ করম্নন তো? কী সব আজেবাজে কথা বকতে শুরম্ন করেছেন-মাথা টাথা ঠিক আছে তো?
মিঠুর মজা লাগে রানীর ধমক শুনে। বলে, বুঝছি না মাথাটা ঠিক আছে কি না, আপনি যে সব দৃশ্য দেখালেন তাতে কীভাবে মাথা ঠিক থাকবে, বলুন? আমি দেখলাম? রানী যেন আকাশ থেকে পড়ে। বলে, আমি কখন দেখলাম! কেন? মিঠু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, আপনিই তো পথ দেখিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন, এখানে না এলে কি ঐ দৃশ্য দেখতে পেতাম?
থাক, অনেক হয়েছে, রানী প্রায় হুকুম করার মতো বলে, এবার চলুন।
কিন্' কিছুই তো দেখা হলো না? মিঠু হতাশ ভঙ্গিতে বলে। বললাম তো, রানী বলে, বাবা যদি না আসতে পারেন, তাহলে আমিই আপনাকে নিয়ে আসবো।
রানীর নিজেরও খারাপা লাগে। আসলেই খুব আগ্রহ নিয়ে মিঠু দেখছিলো চারদিকের গাছপালাগুলো। কিন্' তার মন মেজাজ খিঁচড়ে গেছে সানি তার মুনীরের কান্ড দেখে। সে গেটের দিকে ফেরার জন্য পা বাড়ায়। গেট দিয়ে ঢুকবার সময় দেখেনি, কিন্' বেরম্নবার সময় বিশাল একটা ব্যানার টাঙানো দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কত সালে বাগানটা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কতখানি জমির ওপর। কোন জমিদার কাজটা করেছেন, সব লেখা আছে তাতে, কিছু কিছু গাছের নাম পর্যন্ত। দেখলো, আমাজন লিলিও এই বাগানের পুকুরে আছে। তারপরও দেখলো রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই বাগান দেখতে সে খবরটাও ব্যানারে লেখা রয়েছে।
আমাজান লিলি লন্ডনের বয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটির বাগানে সে দেখেছে। তার কৌতূহল বাধ মানতে চায় না। সে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলে, পুকুর তো দেখা যাচ্ছে দুটো কোনটাতে আছে আমাজন লিলি?
পিস্নজ, শুধু একনজর দেখবো-একটু দেখে আসি চলুন।
সে একজন লোককে দেখে, ডাল পালা কাটবার মস্ত কাঁচিটা তার হাতে, সে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ভাই আমাজান লিলি, মানে বিশাল পদ্মফুল, সেটা কোন পুকুরে আছে বলবেন?
লোকটা মাথা নাড়ায়। বলে, ওটা নাই, মইরা গেছে-
রানী কাছে এগিয়ে এসে বলে, কিন্' ওখানে যে লেখা আছে?
লিখা আছে, ছিল. কিন্' অহন নাই মইরা গেছে, সায়েবে আবার নাকি হইবো-কিন্' হয় না তো-
লোকটার কথা শুনে রানীরও খারাপ লাগে। সে মিঠুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, শুনলেন তো? এবার চলুন, আমি আর একদিন নিয়ে আসবো আপনাকে-

অগত্যা দু'জনে পা বাড়ায় গেটের দিকে।
কিন্' যে ঝামেলা এড়াবার জন্য রানী কেটে পড়তে চাইছিলো-সেই ঝামেলা একে ঠিকই ঘাড়ের ওপর পড়লো। পেছন থেকে তার বান্ধবী সামিয়া হাসিবের ডাক শোনা গেলে, সে রানীর নাম ধরেই ডাকছে।
ওই ডাক শুনে মিঠু পেছনে তাকিয়ে বলে, আপনাকে ডাকছে, একজন- শুনতে পাচ্ছেন না?
অগত্যা দাঁড়াতে হয়।
প্রায় ছুটতে ছুটতে আসে সামিয়া। তার পেছনে পেছনে মুনীর। কাছে এসে খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলে, তুই এখানে আসিস তা তো জানতাম না, কতোৰণ এসেছিস?
অনেকৰণ, রানী বলে, এখন যাচ্ছি।
একলা এসেছিস?
প্রশ্নটা করে সামিয়া অদূরে দাঁড়ানো মিঠুর দিকে তাকায়। বলে, ওনার সঙ্গে এসেছিস, তাই না?
রানী যেন তার কথা শুনতে পায়নি, এমন ভঙ্গিতে গেটের বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।
রানী উত্তর না দেওয়ার জন্যই সম্ভবত মুনীর এগিয়ে গিয়ে মিঠুর দিকে হাত বাড়ায়। বলে, আমি মুনীর, রানী আমার ক্লাসমেট, আপনি বোধহয় বড় আত্মীয়, তাই না?
জ্বী হ্যাঁ, মিঠু বাড়ানো হাতটা ধরে সামান্য ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দেয়।
আপনি কি ঢাকায় থাকেন? মুনীর আবার প্রশ্ন করে।
জ্বী না, মিঠু গম্ভীর মুখে বলে।
আমারও তাই মনে হয়েছিলো, মুনীরের মুখে হাসি লেগেই থাকে। বলে, ঢাকার মানুষ হলে তো কখনো না কখনো নিশ্চয়ই দেখা হতো, রানীর সঙ্গে তো আমরা, মানে আমি আর সামিয়া ওই যে ও হাত তুলে রানীর বান্ধবীকে দেখায়। বলে, আমরা ইউনিভার্সিটির সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে খুব ক্লোজ।
একটু থেমে আবার বলে মুনীর-কিন্' মনে করবেন না, আপনি কোথায় থাকেন? রানীদের বাড়ি যেখানে? আই মীন বগুড়ায়।
মিঠু হেসে ফেলে মুনীরের কথা শুনে। বলে, হ্যাঁ ওই দিকেই।
রানী ওদিকে তথা অস্থির হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়, বান্ধবীর জড়ানো জাপটানো আচরণ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য সে ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। আর বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো-বললামতো, নিশ্চয়ই যাবো- তার অবস্থা দেখে মিঠু এগিয়ে যায়। তারপর রানীকে বলে, কী হলো? দেরি হয়ে যাচ্ছে না। ওদিকে চাচা তো বসে থাকবেন।
মিঠুর গলার স্বর শুনে তার মুখের ভাব দেখে সামিয়া বান্ধবীর হাত ছেড়ে দেয়। আর রানী মিঠুর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, থ্যাংক ইউ, বাঁচালেন।
পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে রানী বলে, আমি ওদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য তাড়াতাড়ি করছিলাম, শেষ পর্যন্ত তবু ওরা ঘাড়ে চেপে বসলো-সত্য আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমাকে।
যেন ও কি ধরে রাখতো?
বাহ রাখতো না? মুনীরকে তো ও চলে যেতে বলেছিলো, আমাকে বললো, আমিও যেন আপনাকে চলে যেতে বলি-কেন, আপনি থাকলে ওর কী অসুবিধা?
আর বলবেন না, খালি ওর মুখে এক গল্প, প্রেমের গল্প শুনবে না হলে বলবে।
রাত্রীর কথা শুনে মিঠুর হাসি পায়। বলে, আপনার বান্ধবীর তাহলে বুঝতে হবে, বয়স হয়নি-ছেলে মানুষই রয়ে গেছে।
দু'জনে হাসতে হাসতে বাড়ি ফেরে। গেট দিয়ে ঢোকার সময় মিঠু স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, মনে থাকবে তো, আপনি আমাকে ওই বলধা গার্ডেন দেখাতে আবার নিয়ে যাবেন।
বাড়িতে গিয়ে রানী দেখে তার বাবা কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে আছেন। মিঠুকে দেখে বললেন, চলো তাহলে, এবার রওনা হই-তোমাকে ওই জায়গাগুলো চিনিয়ে দেবো-তারপর আমি অফিসে যাবো, তুমি নিশ্চয়

বাসায় চলে আসতে পারবে, পারবে না?
হ্যাঁ, তা বোধহয় পারবো, মিঠুর গলায় অনিশ্চয়তার ভাব ফোটে।
আরে পারবে। সমীর হোসেন বন্ধুপুত্রের ঘাড়ে হাত রেখে বলেন, এয়ারপোর্ট থেকে আসতে পেরেছো, আর এতো কাছেই রিকশায় চেপে গেলে আধ ঘন্টার মতো লাগে।
ওই সময় রানী এসে সামনে দাঁড়ায়। বলে, বাবা, আমিও তো যেতে পারি, তোমাদের সঙ্গে, পারি না?
সমীর হোসেন মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, পারবি না কেন, খুব পারবি, চল তা হলে সবাই মিলে যাই।
অল্প কিছুৰণ হাঁটতে হয়, নারায়ণগঞ্জ রোডেই খালি ট্যাক্সি পাওয়া যায়। তারপর দেখতে না দেখতে পৌঁছে যায় শহীদ মিনারে।
সমীর হোসেন বলেন, চিনতে পারছো এটা কোন জায়গা?
মিঠু মুখ তুলে দেখতে দেখতে বলে, হ্যাঁ, চিনবো না কেন? এটাই তো শহীদ মিনার, বাংলাদেশের বাঙালিদের গর্ব আর অহংকারের জায়গা, আমাদের বাড়িতে অনেক ফটো আছে-আমার বাবার এ্যালবামে ভর্তি।
এই শহীদ মিনারটা তৃতীয়বার বানানো হয়েছে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় দ্বিতীয়টা ভেঙ্গে ফেলেছিলো পাকিস্তানের আর্মি, আর প্রথমটা ভেঙেছিলো পুলিশ আর আর্মি মিলে-সেটা ছিলো সাইজে খুবই ছোট-তবে আশেপাশে যেহেতু বড় দালান ছিলো না-পাশে ছিলো মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের বাঁশ আর টিনের তৈরি ব্যারাকের মতো হোস্টেল তাই ওই শহীদ মিনারই দূর থেকে মানুষের চোখে পড়তো।
তবু, কতো উঁচু ছিলো? আপনি দেখেছিলেন?
সমীর হোসেন মাথা নাড়ান। বলেন, আমি কী ভাবে দেখবো? আমি কি তখন ঢাকায় এসেছি? তবে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনেছি-ওই শহীদ মিনার মানে ওই ছোট্ট শহীদ মিনারটা নানা দিক থেকে উলেস্নখযোগ্য।-
মিঠু বলে, হ্যাঁ বটেই তো, হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিকেন্স তো রয়েইছে- না, শুধু সময়ের দিক থেকে না, সমীর হোসেন বলেন, ওটা ছিল মানুষে। মানে সব শ্রেণীর মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতীক-ওটা এক রাতের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিলো, আর তৈরি করেছিলো কারা জানো? তৈরি করেছিলো মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্ররা-আরও একটা উলেস্নখ করার মতো খবর হচ্ছে, ওই শহীদ মিনার গড়ার কাজে ইট সিমেন্ট বালু কিনতে হয়নি। সে সব পাওয়া গিয়েছিলো পুরনো ঢাকার আদিবাসী, যাঁদের কুট্টি বলা হয়, তাঁদেরই মধ্যেকার একজন সরদারের কাছ থেকে-
রানী বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্' সেটা উলেস্নখযোগ্য খবর কেন?
এই তো, সমীর হোসেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে একটু ভর্ৎসনার সুরে বলেন, তুমি বুঝতে পারো না, কেন উলেস্নখযোগ্য, ঘরে বই আছে, সে সব বইতে খবরগুলো ছাপানো হয়েছে অথচ তোমার জানবার আগ্রহ নেই, অথচ মিঠুর কথা ভাবো? সে কতোদূর থেকে, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে জায়গা দেখবার জন্য, খবর জানবার জন্য?
সমীর হোসেন মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে ভোলেন না। বলেন, খবরটা উলেস্নখযোগ্য এই জন্য যে পুরনো ঢাকার লোকরা, বাংলা ভাষার দাবিতে যখন ১৯৪৮-এ প্রথম শুরম্ন হয়, তখন সেই আন্দোলন সমর্থন তো করেই নি, উপরন্' আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর হামলা করে মারধর করেছিলো। পুরনো ঢাকার রাস্তায় ওই সময় ভাষা আন্দোলনের কোনো মিছিলই নাকি ঢুকতে পারেনি।
শহীদ মিনারের বাঁদিকে একটা জায়গা দেখিয়ে বলেন, ওই খানে করা হয়েছিল মিনারটা-ভিৎটা চারকোনা, আর ওপরটা ক্রমশ সরম্ন করে গড়া হয়েছিলো। ২১শে ফেব্রম্নয়ারিতে ছাত্রদের মিছিলে গুলি চললে শহীদ হন কয়েকজন ছাত্র-রফিক, জব্বার আর বরকত-এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বরকত পশ্চিম বঙ্গ থেকে এসেছিলো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে-তার মানে ভাষা আন্দোলনে, অর্থাৎ তখনকার পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলনে পশ্চিম বাংলার বাঙালিরাও অংশগ্রহণ করেছিলো।
সমীর হোসেন, আবার আগের কথা ফিরে আসেন। বলেন, তো হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ২১শে ফেব্রম্নয়ারিতে

আরও অনেক মারা গিয়েছিলো কিন্' তাদের লাশ পুলিশ সরিয়ে নিয়ে যায়, আর সেসব লাশ রাতের অন্ধকারে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

দাফন করা মানে বোঝেন তো, পাশ থেকে রানী বলে ওঠে। হ্যাঁ বুঝি, মিঠু জানায়। বলে, লন্ডনেও মসজিদ আছে, মাদ্রাসা আছে, গোরস্থানও আছে, যে এলাকায় আমাদের বাড়ি, সেই ব্রমলি এলাকাতেই আছে।

রানীর কথার জবাব দিয়ে মিঠু আবার সমীর হোসেনের দিকে তাকায়। বলে, হ্যাঁ চাচা বলুন, সেই নামহীন লাশগুলোও রাতের অন্ধকারে দাফন করা হয়েছিলো-

হ্যাঁ, শুধু সেদিনের লাশই নয়, সমীর হোসেন আবার শুরন্ন করেন। বলেন, পরের দিনও মানে ২২শে ফেব্রন্নয়ারিতেও গুলি চলে মিছিলের ওপর তাতেও মানুষ মারা যায়-সেদিনের লাশও একই ভাবে দাফন করা হয়।

বৃহস্পতিবার ছিলো ২১শে ফেব্রন্নয়ারী। শুক্রবারও ছিল উত্তাল একটা দিন-তার পরের দিন শনিবারেই মেডিক্যাল এর ছাত্রদের মাথায় শহীদ মিনার গড়ার চিন্তাটা আসে-আর ওই দিনই রাতের বেলা শহীদ মিনার গড়ার কাজ শুরন্ন করে তা রাতের মধ্যেই শেষ করে।

আর পরের দিন, মানে চব্বিশে ফেব্রন্নয়ারি সকাল বেলাতেই প্রথম শহীদ মিনার গড়ার খবর সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে যায়, আর দলে দলে মানুষ শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দেয়, টাকা পয়সা দেয়, কোনো কোনো মহিলা গায়ের গহনাও ওই স্মৃতির বেদীর ওপর রেখে যায়। খবরের কাগজে খবরটা ছাপানো হয়েছিলো তবে খুবই ছোট আকারে-চোখে পড়ার মতো ছিলো না, কিন্' তাতে খবরটা জানতে মানুষের অসুবিধা হয়নি, শ্রোতের মতো মানুষ এসে ফুলে ফুলে ভরে দিয়েছিলো সেই স্মৃতির বেদীটি-দু'দিন কি আড়াই দিন ওই শহীদ মিনার মাথা উঁচু করে রাখতে পেরেছিলো, তারপর আর পারেনি ২৬ তারিখ রাতে পুলিশ আর আর্মি এসে ওই প্রথম শহীদ মিনার ভেঙ্গে দিয়ে যায়। দ্বিতীয় বার শহীদ মিনার গড়ে তোলা হয় এখানেই। ততদিনে পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার ছিলো মুসলিম লীগ বিরোধী সেই সরকারের আমলে শহীদ মিনার দ্বিতীয়বার গড়ে তোলা হয়। আর সেই শহীদ মিনারও ভেঙ্গে দেয় পাকিস্তানী আর্মি ১৯৭১ এ এখন যেটা দেখছো, এটা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গড়ে তোলা হয়েছে।

মিঠু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যায়। আর সমীর হোসেনেরও যে কী হয়, তার মুখ দিয়ে সহজ অবলীলায় শব্দমালা বেরিয়ে যেতে তাকে। মিঠুর কখনো মনে হয়, গান শুনছে, কখনো মনে হয় দেব মন্দিরে স্তবপাঠ শুনছে, আবার মনে হয় চার্চ এর ফাদারের মুখ থেকে উচ্চারিত ঈশ্বর পুত্র খৃষ্টের মহিমা গান শুনছে-যা শুনতে শুনতে একই সঙ্গে মনের ভেতরে আপনা থেকে ভক্তি আর ভালাবাসা জেড়ে ওঠে। সমীর চাচার মুখ থেকে যেন সেই ধরনের বানী উচ্চারিত হয় আরও কিছুৰণ। তারপর তাঁকে মেয়ের প্রশ্নের মুখে থামতে হয়। রানী প্রশ্ন করে বাবা এসব ঘটনার কথা ডিটেইলভাবে কোনো বইতে কি লেখা আছে?

সমীর হোসেন। বলেন, তোর তো দোষ আমি একটাই দেখি-তুই বই পড়তে চাস না। আমি যা বলছি সব তো আমার শোনা আর পড়া-কারণ আমি ঢাকায় এসেছিতো অনেক পরে ১৯৫৫ সালে।

কোন বইতে আছে এসব বাবা?

কেন? সমীর হোসেন বলেন, খুঁজে দেখো আব্দুল মতিনের বইতে আছে, আহমদ রফিকের বইতে আছে, বদরন্নদ্দিন উমরের বইতে পাবে। আরও পাবে ডাক্তার সায়ীদ হায়দারের বইতে।

তিনজন পাশাপাশি মিনারের চত্বর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। তার পর দৰিণ দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে। এদিকটাতে রাস্তায় ভীড় কম, গাড়িটাড়িও বেশি চলে না। সমীর হোসেন হাঁটতে হাঁটতে বলেন, এই রাস্তার দু'পাশে আরও গাছ ছিলো। ভাম দিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে হাত তুলে বলেন, এই বিল্ডিংটা তৈরি হয় ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগের পরে নতুন পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানীর সেক্রেটারিয়েট হিসেবে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়-সেক্রেটারিয়েট-এর কাজ আরম্ভ ওই বিল্ডিং-এ হয়েছিলো কিনা বলা মুশকিল, তবে ১৯২১ সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা হলে ওই বিল্ডিং-এ তবে জায়গা হয়। ১৯৪৬ এ

প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তার আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক হাসপাতালও নাকি এখানেই খোলা হয়েছিলো। পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য একটা অংশ রেখে বাকিটার সবই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ আর হাসপাতালের অধীনে চলে যায়। ঢাকা ইউনিভার্সিটির আর্টস বিল্ডিং ছিলো ওই অংশটা, আর কার্জন হল ছিল সায়েন্স বিল্ডিং ওই যে দেখছো লাল বিল্ডিংটা-১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন এর শাসনের সময় বঙ্গভঙ্গ হয়-তার নামেই ওই বিল্ডিং-এর নাম দেয়া হয় কার্জন হল-তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রাণ চাঞ্চল্য বলতে যা বোঝায় তা ছিলো ওই আর্টস বিল্ডিং-এ ই। পরে আর্টস বিল্ডিং আর এখানে থাকেনি, চলে গিয়েছে সলিমউলস্নাহ হল আর ইকবাল হল-এর কাছে।

হঠাৎ সমীর হোসেনের হুঁশ হয় যে তিনি কাকে কী চেনাচ্ছেন, যে মানুষ সদ্য ঢাকায় এসেছে প্রথমবারের মতো। কে কী ভাবে বুঝবে কোথায় কী আছে। বলেন, যাহোক আমি বক বক করছি-তুমি যে কিছুই আন্দাজ করতে পারবে না, সেদিকে আমার খেয়ালেই নেই-

হাঁটতে হাঁটতে তারা মেডিক্যাল কলেজের দৰিণ গেট দিয়ে ঢোকে। গেটের ওপরে তাকিয়ে বলেন, এটা ছিলো প্রক্টরের অফিস, তারপর কয়েক পা এগিয়ে বলেন, ওই যে দেখছো সামনের দিকটা, সিঁড়ি আছে যেখানে ওরই পাশে ছিলো সেই বিখ্যাত আম গাছটা যার তলায় ২১শে ফেব্রম্নয়ারিতে সকাল বেলায় ছাত্রদের মিটিং হয়ে ছিলো আর সেই মিটিংএ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে-সরকারের হুকুম ভেঙ্গে মিছিল করে এসেম্বলিতে যেতে হবে প্রতিবাদ আর রাষ্ট্র ভাষার দাবি জানানোর জন্য- তাহলে এখান থেকেই শুরম্ন? মিঠু জিজ্ঞেস করে। আর ওই সময় সমীর হোসেনের পকেটে মোবাইল বেজে ওঠে। যন্ত্রটা বের করে কানে ধরেন। আর কথা বলেন,-সে কি! কেন হবে না? না হওয়ার তো কারণ থাকতে হবে-আচ্ছা আমি এৰুণি আসছি-তোমরা যেও না-

কথাগুলো যে জরম্নরী আর উত্তেজনাকর তা বোঝা যায়। কিন্' আসলে বিষয়টা যে কী মিঠু তো বুঝতে পারেই না, রানীরও ধারণায় আসে না তার বাবা কী বিষয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন।

সমীর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন সন্ধ্যা হতে তো কিছু দেরি আছে, মিঠুকে এ জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখা, আর শহীদুলস্নাহ হল আর এফ এইচ হলের মাঝখানে যে পুকুরটা আছে ওটাও দেখাবি, আমাকে অফিসে যেতে হচ্ছে, ওখানে একটা জরম্নরী মিটিং-এ আলোচনায় বসতে হবে।

মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি এখন চলি, তোমাকে নিয়ে কাল বিকেলে আবার বেরম্নবো-তখন আবার কথা হবে-অনেক কিছু দেখার আর জানার আছে, এসেছো যখন, ঘুরে ফিরে দেখতে দোষ কি? রানীও অনেক জায়গা চেনে ও-ও দেখাতে পারবে-আমি চললাম।

গেটের কাছেই খালি অটোরিকশা দাঁড়িয়েছিলো, সমীর হোসেন সোজা গিয়ে সেই অটোতে উঠে বসলেন।

রানী মিঠুকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে-স্কুলে পড়ার সময় একুশে ফেব্রম্নয়ারিতে শহীদ মিনারে যখন আসতো মা-বাবার সঙ্গে, তখনও আমগাছের শুকনো গুঁড়িটা ছিলো, তার সামান্য দূরে ছিলো ডোবা মতো একটা জায়গা। মা ঠাট্টা করে বাবাকে বলতেন, তুমি ক'বার যেন বেলতলা আসতে প্রত্যেক দিন?

বাবা হাসতেন আর বলতেন, আমাকে ওভাবে বলবে না। আমি ইচ্ছেমতো আসতাম যেতাম কারণ আমার মাথায় চুল ছিলো, আমি ন্যাড়া ছিলাম না।

রানী ছেলেবেলার সেই পুরনো কথা স্মরণ করে, আর বাবা মায়ের কাছে শোনা সেই সব অতীতের ঘটনার কথা বলে যায় একের পর এক। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ফেব্রম্নয়ারি কুড়ি তারিখে যে সভায় বসে সেখানে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিরম্নদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্' পরদিন আমতলার সভায় ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দশজন করে গ্রম্নপে গ্রম্নপে ছাত্ররা মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামে আর শুরম্ন হয়ে যায় পুলিশের ধরপাকড়। তারপরও ছাত্রদের মিছিল এগিয়ে চলে প্রাদেশিক আইন পরিষদের দিকে। শেষে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজের গেটের কাছে গুলি ছোঁড়ে।

রানীর যতোটুকু জানা ছিলো তাই সে বলে আর হাত তুলে তুলে জায়গাগুলো দেখায়।

ওদিকে সূর্য তখন দিন শেষে বিদায় নিচ্ছে। আকাশের পশ্চিম দিগন্তে, ঢাকা মেঘে তখন রং ধরেছে সেই

রঙিন আলো এসে পড়েছে রানীর শুকনো এলো চুলে। তার মুখে বা গলার স্বরে তার ছেলে মানুষি দুষ্টুমির ভাব নেই। তার ঐ সময়ের চেহারা দেখে কে বলবে যে এই মেয়ে ঝগড়া বাধার জন্য সবসময় মুখিয়ে থাকে-কথায় কথায় খালি খোঁটা দেয় আর খোঁচা মারে।

রাস্তার বাতিগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। অথচ পল্টন ময়দান দেখা তখন বাকি, রেসকোর্সের ময়দানও দেখা দরকার। কেন না ওই ময়দানে জনসভাতেই তো শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

মিঠু হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করে, রানী আমরা এখন কোনদিকে যাচ্ছি?

ওই জায়গাটা দেখবেন, রানী বলে, যেখানে প্রথম গুলি চলে আর ছাত্র-জনতা শহীদ হন। বরকত আর রফিক ছাত্র ছিলেন, কিন্' জব্বার ছিলেন একেবারে সাধারণ মানুষ কৃষকের ছেলে।

দু'জনে হাঁটতে আবার শহীদ মিনারে আসে। রানী ভানদিকটা দেখিয়ে বলে, এখানেই ছিলো মেডিক্যাল ব্যারাক।

সেটা আবার কী জিনিস? মিঠু অবাক হয়ে রানীর মুখের দিকে তাকায়। বলে, মিলিটারির লোকদের থাকবার জায়গাকে ব্যারাক বলা হয় বলে জানি, এখানে কি মিলিটারি থাকতো?

রানী হাসে না। বলে, মিলিটারি নয়, মিলিটারির বাবারা থাকতো এখানে-মেডিক্যাল ছাত্রদের পাকা হোস্টেল তখনও তৈরি হয়নি, তাই বাঁশের চালা বেঁধে ঘর বানানো হয়েছিলো অনেকগুলো, সেইসব ঘরে ছাত্ররা থাকতো, তাই নাম দেওয়া হয়েছিলো ব্যারাক।

এখানেই গুলি চালায় পুলিশ-আর শহীদ হয় রফিক বরকত আর জব্বার।

সন্ধ্যা নামছে তখন। শহীদ মিনারের একটা ধাপে দু'জনে পাশাপাশি বসে। কিছুৰণ চুপ হয়ে থাকে দু'জনে। শেষে মিঠু বলে, রানী, আপনার কি বিরক্তি লাগছে?

না, বিরক্তি কেন লাগবে? রানী একটু যেন হাসে।

না মানে, আমাকে ঘুরে ঘুরে জায়গা দেখাচ্ছেন, পুরনো ঘটনার কথা বলছেন, আবার আমার সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখছেন, বিরক্তি তো লাগতেই পারে।

হ্যাঁ, তা পারে, রানী উঠে দাঁড়ায়। তারপর বলে, আমার বিরক্তি লাগলে আপনি কী করবেন? কিছু করতে পারবেন?

মিঠুও উঠে দাঁড়ায়। বলে, এই তো! রানী আবার নর্মাল মহারানী হয়ে উঠেছেন। এবার বাঁকা বাঁকা কথা বলবেন।

দু'জনে হাঁটে হাইকোর্টের সামনে যাওয়ার আগের মোড়ে বাঁয়ের রাস্তাটা দেখিয়ে বলে, এই রাস্তা দিয়ে কিছুটা গেলে বাঁয়ে পড়বে বাংলা একাডেমি, আর ডাইনে রেসকোর্সের ময়দান, যেখানে ঐতিহাসিক জনসভা হয়েছিলো যে জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। মোড় পার হয়ে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে যাবার সময় উল্টোদিকের কার্জন হল দেখায় রানী। বলে, এই সেই কার্জন হল, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন যে বড়লাট লর্ড কার্জন সেই কার্জনের নামে বিল্ডিংটার নাম রাখা হয়-সেই নাম এখনও চলছে-বিল্ডিং-এর লাল রং যেমন উজ্জ্বল, ধারণ করে রাখা নামটাও তেমনই সমান উজ্জ্বল।

হাই কোর্টের গেট-এ পৌঁছে দাঁড়ায় দু'জনে। মিঠু প্রকান্ড গেটটার দিকে তাকালে রানী বলে, আর এটা হচ্ছে হাইকোর্ট, তৈরি করা হয়েছিলো অবশ্যি গভর্নমেন্ট হাউস হিসেবে, কিন্' শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের হয়েই থেকে গেছে।

আমরা কি এখন আরও হাঁটবো?

মিঠুর প্রশ্ন শুনে রানী হাসে। তারপর রিকশা ডাকে।

দু'জনের যাত্রা এবার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। রানীর মনে কেমন একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। ছেলেদের সেঙ্গ এক রিকশায় চেপে যাতায়াত যে আগে কখনো করেনি তা নয়, কোনো কোনো সময় আপত্তিও বোধ করেছে, কিন্'

এই সন্ধ্যা বেলায়, সে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।
মিঠু সেটা টের পায় কিনা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। তবে মনে হয়, তার মনকে ব্যস্ত করে তোলার জন্য অদ্ভুত একটা প্রশ্ন তোলে। প্রশ্নটা সরাসরি করে না, একটা চিন্তা জাগিয়ে তোলার জন্যই বোধ হয় বলে, রানী আমি সমীর চাচার কথা বাবার কাছে শুনেছিলাম-শুনেছিলাম যে তার মন খুব ভালো, খুব উদার, মানুষকে তিনি ভালোবাসেন, সেই ছাত্র অবস্থায়, মানে বয়স যখন ১৬/১৭, ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় কতো আর বয়স হতে পারে? ওই বয়সে তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছিলেন, ওই বয়সে তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছিলেন, ওই বয়সে জেলও খেটেছেন, মানুষ হিসেবে যে তিনি খুবই ভালো সে ধারণা আমার এমনিতেই ছিলো, আমার বাবার কাছ থেকে শুনেই আমার ধারণাটা হয়েছিলো, কিন্' আমি এখন অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, উনি আমার কথা বিশ্বাস কী ভাবে করতে পারলেন? আমি একটা অচেনা যুবক, বললাম যে আমি তাঁর বাল্য বন্ধুর ছেলে আর উনি তা বিশ্বাস করে নিলেন? সমীর কাকা কি সব মানুষের কথাই বিশ্বাস করে নেন?
রানী মাথা ঘুরিয়ে মিঠুর মুখের দিকে তাকায় আর হাসে। বলে, হ্যাঁ, নেন, ওঁর স্বভাব ঐ রকম।
কেন, অমন স্বভাব কেন থাকবে? মিঠু যেন প্রতিবাদ করতে চায় বলে, আমি যদি চোর-ছ্যাঁচড় হতাম? যদি ডাকাতি করতাম? কিংবা খুন করতাম?
রানী এবার হাসি চাপাতে মুখে আঁচল দেয়। বলে, আপনার যা চেহারা। দেখে তো আমার মনে হয়েছিলো, একেবারে হাবাগোবা ছেলে-বাইরে একা বেরুললে হারিয়ে যেতে পারেন-হয়তো বাবারও তাই মনে হয়েছিলো, তাই হোটেলে গিয়ে থাকতে দেননি।
মিঠু নিজের চেহারা সম্পর্কে ঐ কথা শুনে রাগবে না হাসবে ভেবে পায় না। তাই বলে, ঠিক করে বলুন, সত্যি সত্যি আমার চেহারাটা খারাপ।
রানী মিঠুর হাত ধরে। বলে, চেহারা খারাপ কে বললো?
ঐ যে বললেন, হাবাগোবা।
হাবাগোবা মানে কি খারাপ চেহারা? রানী চোখে চোখে তাকিয়ে বলে, আসলে শুধু চেহারাতেই নয়, বুদ্ধিসুদ্ধিতেও আপনি ওই একইরকম।
তার মানে, আমি একটা ইডিয়ট? মিঠুর গলার স্বরে যেন একটু উষ্মা প্রকাশ পায়।
হ্যাঁ, হাবাগোবা মানে যদি আপনারা, বিলেতের লোকেরা ইডিয়ট বোঝেন, তাহলে তাই-
মিঠু আর কথা বাড়াতে পারেনা। সে হালকাভাবেই কথাবার্তা বলার জন্য ওইভাবে কথা আরম্ভ করেছিলো। এখন সে আর বলার মতো কথা খুঁজে পায় না।
আচ্ছা। রানী এবার কথা আরম্ভ করে। বলে, আপনি তো আপনার মায়ের চেহারা পাননি, তাই না?
আরে! মিঠু অবাক হয়। বলে, আপনি কী ভাবে জানলেন?
আপনার কপালের রেখা দেখে, রানী বলে।
আপনি কি জ্যোতিষী জানেন?
কপালের রেখা দেখার জন্য জোতিষশাস্ত্র পড়ার দরকার হয় না। রানী বলে, গোপাল কাকার সঙ্গে আপনার চেহারার হুবহু মিল আছে- আপনি বাবার চেহারা পেয়েছেন, আপনার বাবা আমার বাবা ম্যাট্রিক পরীৰায় ভালো করেছিলেন, সেইজন্য সেই বাহান্না সালে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করা ছাত্রদের ফটো তোলা হয়েছিলো। সেই ফটোর কপি বাবার কাছে আছে, সেটা আমি দেখেছি-আর বাবার তো দেখার দরকার হয়নি। আপনার মুখ দেখেই তাঁর মনে হয়েছিলো, যে এ তো সেই গোপাল তাঁর বাল্যবন্ধু-এবার বুঝলেন মিস্টার হাবাগোবা কেন?
হ্যাঁ বুঝলাম, মিস খুৎছুটি হোসেন, মিঠু বলে, আপনাকে ধন্যবাদ, আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য।
রিকশা জ্যামের মধ্যে পড়েছিলো, তখন দু'জনের মধ্যে ছেলেমানুষি কথাবার্তা চলে। জ্যাম হালকা হলে, রিকশা আবার চলতে শুরম্ন করে। কিন্' তখন আর কথাবার্তা হয় না। মিঠুকে দেখে মনে হয়, কিছু যেন চিন্তা

করছে।
কী হলো? রানী কনুই দিয়ে গুঁতো দেয়। বলে, হাবাগোবা হোক এক ডিগ্রী কি উপরে উঠে গেলেন?
তার মানে? মিঠু ঠিক বুঝতে পারে না।
মানে সোজা, রানী বলে, হাবাগোবা ছিলেন সেই অবস্থা থেকে এক ধাপ উপরে উঠে একেবারে বোবা হয়ে গেছেন নাকি, সেটাই আমি জানতে চাইছিলাম।
ও সেই কথা! মিঠু হাসে না, বরং গম্ভীরই থেকে যায়। বলে, আমি ভাবছিলাম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ব্যাপারটা নিয়ে যাঁরা করেছেন, তাঁরা বুঝে করেছেন, নাকি না বুঝেই করে ফেলেছেন। তা আমি এখনও জানি না- কিন্' একটা বিষয় তো আমার কাছে খুবই স্পষ্ট-এটা বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির মধ্যে আত্মোপলব্ধির জাগরণ ঘটিয়ে দিয়েছে ঘটনাটা। বাঙালিরা যে একটা জাতি-এই ব্যাপারে সন্দেহের আর কোনো অবকাশ থাকছে না-যে বোধ আর উপলব্ধিতে পৌঁছোতে শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে কোনো কোনো জনগোষ্ঠির, সেখানে এই অঞ্চলের। মানে, বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের মানুষেরা কতো সহজেই না সেই উপলব্ধিতে পৌঁছে গেছে। ইউকেতে বাঙালির বসবাস তো আজ থেকে নয়, বলা যায় প্রায় এক শতাব্দীকাল আগে থেকে। কিন্' বাংলা পত্রিকা বেরম্নচ্ছে কখন? বাংলা টিভি চ্যানেল চালু কখন? কিংবা কালচারাল অর্গানাইজেশনগুলো গড়ে উঠছে কখন? এসব প্রশ্নের উত্তর একটিই, আর তা হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার পর থেকে-যদি প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কেন্দ্রবিন্দুটা সময় আর স্থানের দিক থেকে কখন আর কোথায়? তাহলে জবাবে একটাই জায়গা আর সময়কে পাওয়া যায়-জায়গাটা হলো বাংলার পূর্বাঞ্চলে আর সময়ের বিন্দুটা হচ্ছে ২১শে ফেব্রম্নয়ারি ১৯৫২।
রানী মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যায়। এর মধ্যে রিকশাটা কতোবার জ্যাম-এ আটকালো। রাস্তার কোন্ কোন্ মোড় পার হলো,সে দিকে যে খেয়াল রাখতে পারেনি। খৃষ্টানদের গোরস্থানের মোড় পৌঁছে রিকশাওয়ালা পেছনে মুখ ফিরিয়ে যখন বলে, এইবার কোনদিকে স্যার, কন।
তখন রানীর যেন ঘোর কাটে। এতোৰণ যেন অজানা অচেনা একটা ঘোরের মধ্যে ছিলো সে। রিকশাওয়ালার কথার জবাবে সে বলে, এবার ডানদিকে যাবে।
বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামার পর নিজেকে তার অন্যরকম লাগে। কেমন মনে হয়, তার যেন অন্য কোথাও যাওয়ার কথা। মাঝ পথে তাকে নেমে যেতে হচ্ছে।
সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় ওঠার সময় পেছনে তাকালে দেখে মিঠু তাকেই দেখছে। না রাগ হয় না তার। কেন না তার দৃষ্টিতে মুগ্ধতার কোনো রকম ভাব সে দেখে না, লালসার তো নয়ই। তার মনে প্রশ্ন জাগে, কী দেখে মিঠু?
সে সিঁড়ির যে কটা ধাপ উঠেছিলো সে কটা ধাপ আবার নেমে এসে মিঠুর পাশে দাঁড়ায়। জানতে চায়, এখন কি কোথাও যাবেন?
নাহ্ কোথায় যাবো? কাল তো আবার বাইরে ঘুরবো। সমীর চাচা বিরক্ত হবেন জানি, তবু ওকে আমার দরকার-উনি সব ইতিহাস জানেন। আর এতো সুন্দর করে বলেন যে তাঁর সব কথা মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে যায়।
তো ঠিক আছে, রানী বলে, মনকে মেলে ধরার সময় তো রয়েইছে, মনটাকে মেলে ধরবেন আর বাবা তার কথার তীর ইচ্ছে মতোন ছুঁড়ে ছুঁড়ে গাঁথবেন আপনার মেলে ধরা মনে। এখন কি দাঁড়িয়েই থাকবেন? নাকি ঘরে গিয়ে চা টা কিছু খাবেন।
মিঠু কিছু বলে না, চুপচাপ বাড়ির ভেতরে ঢোকে-বেশি দেরি হয় না মজিলা হাঁক দিয়ে জানিয়ে দেয় যে টেবিলে চা দেওয়া হয়েছে।
তখন চায়ের টেবিলে রানী কথাটা তোলে। বলে, মিঠু বাবু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? মনে কিছু করবেন না পিস্নজ। বলুন কী জিজ্ঞেস করবেন? মিঠু হাসতে হাসতে মুখোমুখি তাকায়। না, কথাটা সিরিয়াস কিছু না, রানী বলে, আমার একটা কৌতূহল-আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে-আমি জানি আমি

একটা ফাজিল টাইপের মেয়ে-প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে কথা বলে মজা পেলেও পরে আমাকে সাধারণত কেউ পছন্দ করে না, আমার কথা শুনে বিরক্ত হয়। তখন আমাকে এ্যাভয়েট করে-কিন্' সকাল থেকেই দেখছি আপনার চোখে মুখে বিরক্তির কোনো চিহ্ন নেই, বরং উল্টো আপনি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন? আপনি আমার দিকে কেন দেখেন ওভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে?

মিঠু দারুণ বিব্রত বোধ করে রানীর প্রশ্ন শুনে। বলে, আমি মানুষটা আসলে ভালো নই রানী, উল্টে পাল্টে ঘাঁটাঘাঁটি করে সব কিছু দেখার একটা বদঅভ্যাস আছে আমার। প্রথমে তো মনে হয়েছিলো, আপনি বাবা মায়ের আদুরে মেয়ে, তাই একটু বেশি কথা বলেন, পরে মনে হয়, আমার ধারণা ঠিক নয়, বাইরে হালকা আর ঝগড়াটে ভাব দেখালে কী হবে, আপনি খুবই সিরয়াস মেয়ে, যখন ধারণাটা বদলাতে থাকে, তখন থেকে আমি মনে মনে মিলিয়ে দেখতে চাইছি, আপনার মতো কোনো মেয়ের সঙ্গে কি আমার কখনো দেখা হয়েছিলো? বাইরে থেকে ফেরার সময় যে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তাহলে তখন আমি আপনাকে দেখছিলাম,আপনার সিঁড়ি বেয়ে ওঠার ভঙ্গিটা কলকাতার জেঠি মায়ের বোনঝি বকুলের মতো। সেও ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করেছে, কতো জায়গায় ঘুরেছি ওর সঙ্গে, কিন্' ও ওই সব জায়গা সম্পর্কে কিছুই বলেনি। বলেনি, কারণ সে জানে না।

বাহ্ সবাই কি একরম হবে নাকি? রানী হেসে ওঠে। বলে, মিঠু বাবু আপনার সত্যিই তুলনা হয় না।

এই, আমাকে কথাটা শেষ করতে দিন, মিঠু প্রায় ধমকে ওঠে। বলে, সবাইকে একরকম আমি কিসের জন্য ভাবতে যাবো? আমি দেখতে চাই মানুষের কমিটমেন্ট, তার সেন্স অফ বিলংটাংনেন্স কী রকম-আমি কি কথাটা বোঝাতে পেরেছি? মিঠু জিজ্ঞেস করে।

রানী গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকে মুখোমুখি, কথা বলে না।

মিঠু আবার জিজ্ঞেস করে, আমি কি আমার কথাটা, মানে ওই যে বললাম, সেন্স অফ বিলংগিংনেস, কথাটা কি আমি বোঝাতে পেরেছি? পিস্নজ বলুন না, মিঠু অনুরোধ করে। রানী গম্ভীরভাবে বলে, আপনার কথা আগে শেষ করুন। শেষ তো করেছি আমার কথা! মিঠু জানায়।

তাহলে আপনার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে কেন?

রানীর গলার স্বরে যেমন তেমনি তার চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

মিঠু হতাশ হয়ে বলে, ঠিক আছে, আমিও তাহলে মুখ খুলবো না। তাহলে যে আমার জানা হবে না। আমার দিকে আপনি কেন তাকান, কী দেখেন আমার দিকে তাকিয়ে? আপনি কি রাস্তার বখাটে লোকদের মতোই আমাকে দেখেন? নাকি অন্যকিছু দেখেন?

রানীর কথার জবাবে মিঠু বলে, আপনি আমাকে তো কথা বলতে দিচ্ছেন না।

কেন দেবো? রানী বলে, আপনি অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমার তুলনা কেন করবেন? আমার মান-সম্মান নেই?

আমি তো আসলে তুলনা করছি না, সুন্দর কি অসুন্দর, তা বলছি না বুদ্ধি কম কি বেশি, তা বলছি না, আচার-ব্যবহারের কথা বলছি না-আমি বলতে চাইছি-দেশ, দেশের মানুষ, তাদের স্ট্রাগল, তাদের স্যাক্রিফাইস এসবের সঙ্গে কার কেমন সম্পর্ক। কে কমিটেড, কে কমিটেড নয়-আমি সেই কথা বলতে চাইছি।

ঠিক আছে, তাহলে বলুন। রানী মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে।

কী বলবো আর, মিঠু বলে আমার বলা তো শেষ-আমি তো বললাম, ওসব জিনিস, মানে ওই কমিটমেন্ট আর বিলংগিংনেস আপনার মধ্যে দেখতে পাই, তাই দেখি-

কী দেখেন, রানী চোখে চোখে তাকায়। বলে, আমার গায়ে কি ওসব লেখা আছে?

হ্যাঁ আছে, মিঠু এবার রেগে যায়। বলে, আপনি বাইরে বেরুবার সময় শাড়ি ছাড়া অন্য পোশাক কেন পরেন না? আমার ভাল লাগে না, তাই-আর-

রানী পুরোটা বলে না,

আর কী? মিঠু জানতে চায়।

আর, আমার মা আমাকে শাড়ি পরিয়ে খুশি হতেন-মাকে আমি কখনো অন্য পোশাক পরতে দেখিনি-তাঁর বয়সী অন্যরা অনেকেই পরতেন, কিন্' তিনি কখনো পরেননি-
মিঠুর চেহারায় আবেগ জেগে উঠতে দেখা যায়, বলে আমার মাকেও আমি অন্য পোশাক পরতে কখনো দেখিনি-
চায়ের টেবিলে বসেই কথা হচ্ছিলো ওই সময় সমীর হোসেন ফেরেন। দু'জনকে চায়ের টেবিলে মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে বলেন, কি ব্যাপার, তোমরা কখন ফিরেছো?
এই তো কিছুৰণ আগে, মিঠু জানায়।
না বাবা, রানী বলে, সন্ধ্যার পরপরই ফিরে এসেছি।
তোমরা কি আর কোথাও গিয়েছিলে?
হ্যাঁ গিয়েছিলাম চাচা, মিঠু বলে, রানী কার্জন হল দেখালেন, হাইকোর্ট দেখালেন, বাংলা একাডেমি চিনিয়ে দিয়েছেন, রেসকোর্স ময়দানও।
না বাবা, মিঠু বাবু খালি বাড়িয়ে বাড়িয়ে কথা বলেন, ঐ রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে দূর থেকে জায়গাগুলো দেখিয়েছি শুধু ভাবছি কাল আবার যাবো-তুমি যাবে না?
দেখি, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলেন, সমীর হোসেন। জানান, অফিসে একটা ঝামেলা বেঁধে গেছে-পত্রিকার নতুন মালিকরা নতুন জার্নালিষ্টদের পে-স্কেল দিতে চায় না-ঝামেলাটা ভালো মতোই পাকিয়ে উঠেছে-তবু দেখি কী হয়, সুযোগ পাই কি না-
মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলেন, তা বাবা, তুমি কোথায় কোথায় যাবে বলে ভাবছো-
মিঠু হাসে। বলে, আমি তো চাচা কিছু জানি না, কোথায় কী আছে আর কোন জায়গায় কী রকম সিগনিফিকেন্স তা অবশ্যি ঠিক, সমীর হোসেন বলেন, রানীর ওসব মনে আছে কি না বলতে পারবো না। তবে বলধা গার্ডেন সম্পর্কে একটা খবর তোমাকে জানিয়ে রাখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওই বলধা গার্ডেন দেখতে চেয়েছিলেন এবং দেখেও গিয়েছেন। কিন্' আর একটা গোলাপ বাগান ছিলো কাছেই। সেই বাগানের মালিক রবীন্দ্রনাথকে তাঁর বাগান দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান, কিন্' রবীন্দ্রনাথ ওই রোজ গার্ডেন দেখতে যাননি-এই ঘটনাটা আসলেই ঘটেছিলো কি না তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে রবীন্দ্রনাথ যে বলধা গার্ডেন দেখার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে-আর রবীন্দ্রনাথের অমন ইচ্ছা প্রকাশের কারণও জানা গেছে। কারণটা হলো বৃটিনের রয়াল হর্টিকালচারাল সোসাইটি সারা বিশ্বের গাছপালায় সমৃদ্ধ একটি বাগান। বলধার জমিদার সেই রয়াল হর্টিকালচারাল সোসাইটির আদলে বিশ্বের বহু দেশের গাছপালা লাগিয়ে এই গার্ডেনটা গড়ে তোলেন-আর সেজন্যেই রবীন্দ্রনাথ এই বাগান দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রয়াল হর্টিকালচারাল সোসাইটির বাগান মিঠুর দেখা। সে একটু অবাক হয়ে বলে, কই এ খবরটা কারও কাছ থেকে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।
শোনার দরকার নেই, গেটের কাছেই দেওয়ালে শ্বেতপাথরের একটা ফলকে কথাটা লেখা আছে, গিয়ে দেখে এসো, দেখলেই রবীন্দ্রনাথ কেন আগ্রহী হয়েছিলেন বলধা গার্ডেন দেখার জন্য তা বুঝতে পারবে।
প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য সমীর হোসেন আবার ইউনিভার্সিটি এলাকার কথা তোলেন। বললেন, আমি আসার আগে তোমাদের শহীদুলস্নাহ হল আর ফজলুল হক হলের মাঝখানের পুকুরটা দেখে আসতে বলেছিলাম, দেখেছো?
মিঠু রানীর মুখের দিকে তাকায়। রানী একটু যেন বিব্রত হয়। বলে না বাবা ওদিকে যাওয়া হয়নি, আমি মেডিক্যাল হোস্টেল ব্যারাক এর জায়গাটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।
ঠিক আছে, সমীর হোসেন জানান। বলেন, ওটা খুব বেশি উলেস্নখযোগ্য নয়-শোনা যায় ২০শে ফেব্রম্নয়ারির সর্বদলীয় কর্মপরিষদের মিটিং-এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলে, কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী আর ছাত্রনেতা ওই পুকুর ঘাটে বসে রাতের বেলা সিদ্ধান্ত নেন, যেভাবেই হোক পুলিশের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে ছাত্ররা প্রভিন্সিয়াল এ্যাসেম্বলি ঘেরাও করবে-অনেকে মনে করেন ওই সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী আমতলার মিটিং-এ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ঘোষণা দেওয়া হয়।
সমীর হোসেন ঢাকায় ছিলেন না, তখন বগুড়ায় ছিলেন, বয়সও তখন সবে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন তখন, কিন্' অনেক খবর জমা রয়ে গেছে তাঁর স্মৃতিতে। সেই রাতে খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেকৰণ পর্যন্ত সেই সব স্মৃতির কথা বলেন একটা একটা করে।
কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যান সমীর হোসেন। কারণ তখন তাঁর চোখ পড়েছে দেয়ালের ঘড়িতে। বলে ওঠেন, কথা বলতে বলতে খেয়াল নেই যে, রাত বাড়ছে। যাও তোমরা, ঘুমিয়ে পড়ো, রাত বারোটা বাজতে চললো।
রানী মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলে, তাহলে কালকের প্রোগ্রাম ওই একই, ভাষা আন্দোলন দেখা, তাই না?
হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে, মিঠু জানায়, বলে এখন চাচা কী বলেন, সেটাই আসল কথা। তুমি তো বললে, বগুড়াতেও নাকি যাবে? সমীর হোসেন স্মরণ করিয়ে দেন। হ্যাঁ ওখানেও যাবার ইচ্ছে আছে, বাবার কাছে মায়ের কাছে শুনেছি ওখানেই ছিলো আমাদের চৌদ্দপুরন্নষের ভিটা, এ্যানসেস্ট্রাল হোম।
শুধু তোমাদের কেন হবে, সমীর হাসতে হাসতে বলেন, সব বাঙালিরই ওই জায়গায় এ্যানসেস্ট্রাল হোম ছিলো বলতে পারো। পুন্ড্র নগর তো ওখানেই ছিলো, বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলোর একটা তো ওইখানেই-ওখানেই ছিল পালদের শাসন কেন্দ্র, পালদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিলো গোটা ইষ্টার্ন ইন্ডিয়ায়-সেখানে ছিলো তোমাদের এ্যানসেস্ট্রাল হোম, তোমাদের গায়ে শিহরণ জেগে ওঠা উচিত। ছাত্র অবস্থায় আমরা কতো ঘুরেছি ওই সব প্রাচীন জায়গায়- তোমার বাবা আর আমি ছিলাম হারিয়ে আশা, বুঝলে? শব্দটা শুনেছো কখনো?
হ্যাঁ কাকা, শুনেছি, মায়ের কাছে, মিঠু বলে। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে একবার সে বলে, তাহলে পরশুদিনই বগুড়া রওনা হওয়া যায়, আমি পরশু দিনই যাবো।
বাবা, তুমিও তো যেতে পারো। রানী বলে, অনেকদিন হলো ওদিকে যাও না, কামাল চাচারা কতোবার বলে গেলো, তোমার সময়ই হয় না-কী যে করো?
সমীর হোসেন দু'মিনিট চিন্তা করেন, তারপর বলে ওঠেন, তাহলে তাই চল, আমিও সঙ্গী হবো তোদের-তিনজন মিলে এবার প্রাচীন পুন্ড্র নগরীতে ভ্রমণ করবো।
খুশিতে রানীর মন নেচে ওঠে। বিছানায় যখন গা রাখে তখন প্রায় বারোটা বাজে। তখনও তার মনে খুশি নাচানাচি করছে। অনেকদিন পর তো বাহিরে যাবে-তাও কোনো কাজে যাচ্ছেন না তার বাবা, শুধুই ঘুরতে আর বেড়াতে যাচ্ছেন-এবার সেই মেলায় যাবে, যেটা খুবই প্রাচীন আর বিখ্যাত। যে মেলায় জামাইদের ভীড় হয় বেশি।
কথাটা মনে হতেই তার হাসি পায়-তার বাবার তো বউ মরে গেছে, আর মিঠু তো এখনও বিয়েও করেনি আর সে নিজে জামাই হবে কী ভাবে? মেয়ে মানুষ বড়জোর বউ হতে পারে-কিন্' তাও কি সে হয়েছে? কখনও কি হবে?
প্রশ্নটা তার মনে জাগবার কারণ আছে। কারণ অন্য কিছু নয়, ছেলেরা মানে পুরন্নষ মানুষ কাছাকাছি আসতে চাইলেই তার বিশ্রী লাগে। সারা শরীরে অন্তত একটা ঘেন্নার ভাব বিজবিজ করতে থাকে। অল্প বয়সে একটা বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতার কারণে। পুরন্নষ মানুষ, বিশেষ করে কমবয়সী পুরন্নষ মানুষ দেখলেই তার মনের ভেতরে আর একটা মেয়ে যেন জেগে ওঠে, আর মানুষটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আর তাকে বলে, দেখ এইবার তোর ঘাড়ের দিকে তাকাবে, দেখলি তো কেমন তাকালো, নজর তো নয়, যেন জিভ, মনে হবে তোকে চাটছে-এইবার দেখ, তোর বুকের দিকে তাকাবে, তুই মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়া, তারপরও ও নজর সরাবে না, তুই সামনের দিকে এগোলে তোর কোমরের দিকে তাকাবে, কেন তাকাবে জানিস না? তোর কোমর যদি সরন্ন যা তাহলে হিপ দুটো উঁচু হবে, তখন তোর হাঁটা দেখবে-পুরন্নষ মানুষের মতো খারাপ প্রাণী আর হয় না বুঝলি?
হ্যাঁ, সে নিজে নয়, তারই ভেতরকার আর একজন। যার জন্ম হয়েছে তার ১৪/১৫ বছর বয়সে যখন কলেজে

সবে ভর্তি হয়েছে ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে। ইংরেজিতে কাঁচা ছিলো, এসএসসিতে ভালো নম্বর পায়নি-তাই মা একজন প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলেন, ইউনিভার্সিটির ফাইনাল ইয়ারের এক ছাত্রকে। ছাত্রটি রোজ সন্ধ্যার আগে আসতো আর সন্ধ্যার পর চলে যেতো-ওই সময়ের মধ্যে সে পুরনো একখানা গ্রামারের বই থেকে সিনটাক্স বোঝাতো টেন্স শেখাতো, আর্টিকেল প্রিপোজিশন ঠিক মতো কী ভাবে বসাতে হবে বই দেখে দেখে সেসব বোঝাতো। তবে বইখানা সে দিতো না, দেখতেও দিতো না। একদিন এক ফাঁকে বইখানা সে উল্টে দেখেছিলো, ওই গ্রামার বইয়ের লেখকের নাম দেখেছিলো সে নেসফিল্ড।

তো পড়াতে পড়াতে হাত ধরতো, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকতো, অস্ফুট স্বরে কী যেন বলতো বিড়বিড় করে। তখন মনে হতো ছেলেটাকে পাগলামিতে পেয়েছে। একদিন সন্ধ্যার আগেই এসে হাজির। মা তখন বাহিরে কাজে বেরিয়ে গেছেন-সেদিন ওই সময়, আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ বলতে বলতে দুহাতে বুকের ওপর চেপে ধরে। তারপর মুখে গালে কপালে চুমু খায়, ঠোঁটে পারে না কারণ সে তখন চিৎকার করছিলো আর নিজেকে ছাড়াবার জন্য হুটোপুটি আরম্ভ করে দিয়েছিলো। কোনোভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই সে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরের বারান্দায় গিয়ে চেঁচামেচি শুরম্ন করলে পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? ও রানী কী হয়েছে-তো রানী ঘটনাটা আসলে কী হয়েছে তা কী ভাবে প্রকাশ করতে না পেরে শুধু চোর চোর ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করতে থাকে।

পাশের দুই বাড়ির লোকেরা এসে বাড়ির ভেতরটা খুঁজে দেখে যায়। কিন্' কাউকেই পায় না, না চোরকে, না ডাকাতকে।

ঘটনাটা সে মায়ের কাছে খুলে বলে। তখন থেকে আর কখনো তার জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখা হয়নি। কিন্' প্রাইভেট টিউটর না রাখা হলে কী হবে-ওই একটা অভিজ্ঞতাই তাকে শিখিয়ে দিয়েছে পুরম্নষ মানুষ কোনভঙ্গিতে মেয়েদের দিকে তাকালে, তার কী মানে বুঝতে হবে। কতো বছর আগের ঘটনা, কিন্' ঐ ঘটনা তার মনের গড়নটাই বদলে দিয়েছে, পিকনিকে যাবার

This File downloaded from
http://doridro.com